বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

বিজ্ঞান ও সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও ঈশ্বর, পরমাত্মা ও
জীবাত্মা, মানবের ইতিহাস, পরমাণুর
গঠন, রমণ-রশ্মি

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩১

বার আনা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় -
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার-শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

বাল্যকালে

যাহার সহিত এক বাটীতে বাস করিয়াছি, একত্রে

খাইয়াছি, পরিয়াছি, খেলা করিয়াছি

এক সঙ্গে স্কুলে গিয়াছি

সেই বাল্যবন্ধু

বিজ্ঞানাচার্য্য, স্বদেশ-প্রেমিক, মহানুভব

সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে, টি ; ডি-এস্-সি,

মহোদয়কে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত

অর্পণ করিলাম

ভূমিকা

স্বাধীন চিন্তার জন্য ভারত চির প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কালে যখন ভারতে ৩৩টী বা ৩৩ কোটী দেবতার উপাসনা ও ক্রিয়া-বহুল যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের প্রভূত প্রচার ছিল, সে সময়েও পতঞ্জলি ঋষি "ঈশ্বর প্রণিধানাৎবা", সাঙ্খ্য-দর্শন প্রণেতা কপিল ঋষি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "প্রমাণাভাবাৎ", চার্ব্বাক ঋষি "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।" ইত্যাদি সনাতন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বাক্য সকল উক্তি করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পরবর্ত্তী যুগে যৎকালে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল সে সময়েও আভানক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বেদ-বিরুদ্ধ মত সকল প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল মতে জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন। স্বাভাবিক যে যে গুণ আছে, তৎবশতঃ দ্রব্য সংযুক্ত হইয়া সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। জগতের কেহ কর্ত্তা নাই। ইহাঁরা পরলোক ও জীবাত্মা স্বীকার করেন; চার্ব্বাক কিন্তু তাহাও করেন না।

স্বাধীন-মত প্রচার সম্বন্ধে হিন্দু-ভারত যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, খৃষ্টিয়ান ইউরোপ সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। সেখানে যখনই কেহ কোন যুক্তিসঙ্গত স্বাধীন-মত প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রচলিত মতের বিরোধী বলিয়া নানারূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল; কাহারও বা প্রাণদণ্ডও হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে সভ্যতার উন্নাত ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা নব নব তথ্য সকল আবিষ্কৃত হওয়ায়, ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে আর সেরূপ গোড়ামী দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে তথায় সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ নিজ স্বাধীন-মত প্রচার করিতেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জগৎ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে এই পুস্তকে লিখিত হইল। এই পুস্তকে লিখিত প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে সময়ে সময়ে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়ায় এই পুস্তকে অনেক স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। ইহাতে লিখিত বিষয়গুলি প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গ্রহণ করা বা না করা তাঁহাদের বিবেচনাধীন। ইহা তাঁহাদের চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া উপহার দিলাম।

অক্ষয়-লজ
১১২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৯৩১

গ্রন্থকার

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব

১

এই জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ, মুসলমানদের কোরাণ, খৃষ্টিয়ানদের বাইবেল ইত্যাদি ধর্ম্মপুস্তক সকলে—এই জগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি কি প্রকারে ও কি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে। সৃষ্টি-ব্যাপার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মতামতের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁহারা এই জগৎ কেমন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং কি নিয়মে এই সৃষ্টিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে—বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু দিন হইতে গবেষণা দ্বারা তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ, এই পৃথিবীস্থ জীবজন্তু সকল কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে জীববিদ্যা (biology) বিষয়ক গ্রন্থ সকল, জীবদেহে কোথায় কি আছে এবং কি নিয়মে তাহাদের কার্য্য হইতেছে তদ্বিষয়ে শরীর-বিজ্ঞান (physiology) নামক গ্রন্থাদি, উদ্ভিদ-দেহে কোথায় কি আছে ও কি নিয়মে তাহাদের কার্য্য হইতেছে তদ্বিষয়ে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান (botany) নামক গ্রন্থাদি, জড়পদার্থ সকল কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ও কি প্রকারে উৎপন্ন

হইল তদ্বিষয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান (physics) ও কিমিয়-বিজ্ঞান (chemistry) নামক গ্রন্থাদি, এই পৃথিবী কি করিয়া ইহার বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তদ্বিষয়ে ভূ-বিজ্ঞান (geology) নামক গ্রন্থাদি, আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রাদি কি প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি নিয়মে তাহাদের গতি পরিচালিত হইতেছে তদ্বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান (astronomy) নামক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বহু দিন হইতে যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা, বহুদর্শন ও গবেষণা দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মানবের মন বলিয়া যে একটী জিনিষ আছে তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ তৎসম্বন্ধে যাহা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়া যে শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে তাহার নাম মনোবিজ্ঞান (psychology)। মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সিদ্ধান্ত সকল চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় না—চিন্তা ও অনুভব দ্বারা জানা যায়। শেষোক্ত বিজ্ঞানের বর্ণিত তথ্যগুলি ভিন্ন, অপর বিজ্ঞান সকলের বর্ণিত তথ্যগুলি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তাহার যথার্থতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমরা কিমিয় বা রসায়ন-বিদ্যা (chemistry) হইতে অবগত হইয়াছি যে, পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যই হয় একজাতীয় আদি ভূত (elements) সকলের সমষ্টির দ্বারা অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আদি ভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। অদ্যাবধি যতগুলি আদি ভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৯০টীরও অধিক হইবে। আদি ভূত সকলের (elements) অতি সূক্ষ্মাংশ, যাহাকে আর বিভাগ করা যায় না, তাহার নাম পরমাণু বা এটম (atom)। বিভিন্ন প্রকার আদি ভূত সকলের মিশ্রণ দুই প্রকারে হইয়া থাকে, যথা, বাহ্যিক (mechanical) ও আন্তরিক বা রাসায়নিক (chemical)। কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম গন্ধকচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ একটী

পাত্রে রাখিয়া একত্র মিশাইলে ধূসর বর্ণ একটী পদার্থ দেখা যায়। এই মিশ্রণে গন্ধকচূর্ণের ক্ষুদ্র কণা সকল অবিকৃত অবস্থায় পাশাপাশি থাকিয়া যায়। একখণ্ড চুম্বক উহার উপর ধরিলে লৌহচূর্ণ সকল গন্ধকচূর্ণ হইতে পৃথক হইয়া চুম্বকের গায়ে লাগিয়া যায় এবং গন্ধকচূর্ণ পৃথক পড়িয়া থাকে। এই প্রকার মিশ্রণকে বাহ্যিক মিশ্রণ বলা হয়। কিন্তু যদি উক্ত মিশ্রিত পদার্থটীকে উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া কৃষ্ণবর্ণ সলফাইড অব আইরন (sulphide of iron) নামে একটী সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন আদি ভূতের পরমাণু সকলের এইরূপ আন্তরিক মিশ্রণকে রাসায়নিক মিশ্রণ বলা হয়। এইরূপ অম্লজান (Oxygen) ও উদজান (Hydrogen) দুইটি আদি ভূতের পরমাণুর রাসায়নিক মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং অম্লজান (Oxygen) ও যবক্ষারজান (nitrogen) নামক আদি ভূতের পরমাণুর বাহ্যিক মিশ্রণে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে আমি পূর্ব্বোক্ত আদি ভূত পরমাণু (Atom) সকলের আরও এক সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বলিব। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছেন যে এই পরমাণু বা এটম সকল অবিভাজ্য একটী মূল পরমাণু নহে!

প্রত্যেক জড়পরমাণু বা এটম, (Electron) ইলেকট্রন নামক অবিভাজ্য ও এটম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থের একপ্রকার বিশিষ্ট মিলন দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন এটমে শত শত ইলেকট্রন প্রবলবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহারা এক জাতীয় এটম হইতে অন্য জাতীয় এটমে সংক্রামিত হইতে পারে। রেডিয়ম (radium) নামক এটম এর ভিতর যে রেডিও ক্রিয়া (Radio activity) দেখা যায়, উহা তৎস্থিত

ইলেকট্রন সমূহের স্পন্দন ও গতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। তড়িতের (elcticity) গতি ইলেকট্রন (Electron) দ্বারাই সঞ্চারিত হয়। অল্ট্রা ভাইয়োলেট (ultra violet) ও রঞ্জন Rontgen রশ্মি সকলের প্রকাশ ঐ ইলেকট্রন দ্বারাই আবার হইয়া থাকে। ইলেক্ট্রন (Electron) একটী জড় পদার্থ, কি কোন রুদ্ধ শক্তির স্ফুরণ? কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে জড় বলিয়া কোন পদার্থ-ই নাই। যাহা জড়পদার্থ রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় উহা কোন অনির্ব্বচনীয় রুদ্ধ শক্তির স্ফুরণ। ঐ রুদ্ধ শক্তির স্ফুরণ হইয়া অত্যধিক বেগবিশিষ্ট হইলে জড়াকার ধারণ করে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ ঐ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে ইংরাজিতে উদ্ধৃত করা হইল ;

"In the theory of relativity matter is recognised as one of the forms, which energy may take and it is believed that mattor can turn into radiant energy under some conditions. In that sense matter may be called destructible but its intrinsic energy is not. Nothing goes out of existence but only changes its form."

এইবার আমি এই পৃথিবী ও সৌরজগতের আদি ও উৎপত্তির বিষয় কিছু বলিব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই অনন্তব্যাপী শূন্যময় আকাশে ইথার (Ether) নামক একটী পদার্থের অনুমান করেন। এই ইথারের কোন প্রকার আকার বা গুরুত্ব নাই। ইহা শূন্যময় আকাশে সম্পূর্ণ রূপে পরিব্যাপ্ত। আকাশে এমন কোন স্থান খালি নাই যেখানে ইথার নাই। কোটী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি হইতে যে আলোক পৃথিবীতে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এই ইথারের কম্পনে হইয়া থাকে ; এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক দৃশ্য (electromagnetic

phenomena) সকল ইথারকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া ইথারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন।

ইলেকট্রনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, শক্তি মাত্র অবলম্বনে ইথার নামক যে পদার্থ অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে, ঐ শক্তি প্রথমে গতিরূপে প্রকাশিত হইয়া ইথার সমুদ্রে এক তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছিল। তাহার ফলে ইথার সমুদ্রের স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ কণা সকল উৎপন্ন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে। এই বিদ্যুৎ কণা সকল দুই প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের ইলেকট্রন ও প্রোটন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ঐ ইথার লইয়া আবার অনেক গোলযোগ বাধিয়াছে। কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন বুঝাইতে হইলে ইথারের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না ; আবার সময়ে সময়ে উহার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সুতরাং ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে ঐ দুই মতের মধ্যে এমন একটী শৃঙ্খলের অভাব (missing link) আছে, যাহা এখনও ভালরূপ জানা যাইতেছে না। বৈজ্ঞানিকদিগের এরূপ ধারণা যে ঐ দুই মত যদি মিলাইতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের বাস্তব জগতের একটা মস্ত আবিষ্কার হইবে, যাহাতে জগতের উৎপত্তি প্রকরণের মীমাংসা অনেক দুর অগ্রসর হইবে।

এই শূন্যময় আকাশের ভিতর কিরূপে পরমাণুর (atom) উৎপত্তি হইল, উপরিউক্ত কারণে তাহা এখন স্পষ্টতঃ বলা ঠিক নয়, তবে এই মাত্র বলা যায় যে ইলেকট্রণ (electron) যাহা একটী সূক্ষ্ম পরমাণু ও এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আধার, ও প্রোটন (Proton) নামে অপর একটী সূক্ষ্ম পরমাণু যাহা ভিন্ন এক প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আধার, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ হইয়া একটী এটমের উৎপত্তি হইয়াছে। এই

দুই বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি কখনও মিলিত বা বিচ্ছিন্ন হয় না। যখন কোন জড়শক্তি (Physical force) উহাদের বল পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তখন ঐ পরমাণু অন্য এক প্রকার পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে দুই বিভিন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ ও একত্র সমাবেশ, গতি ও স্পন্দনের নানা রূপ ব্যবস্থাতে বিভিন্ন প্রকার পরমাণু (atom) সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতির সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি (Positive and negative), যাহার একের সহিত অন্যের সংঘর্ষ হইলে মুহূর্ত্তে পরমাণু বা এটম সকলের ধ্বংস প্রাপ্তির সম্ভাবনা অথচ তাহারা এরূপভাবে একত্র পরমাণু বা এটমের মধ্যে বসবাস করিতেছে যে, সহসা তাহাদের মধ্যে কলহ বাধে না। যদি তাহাদের গতি বা স্পন্দনের সামান্য মাত্র বিপর্য্যয় ঘটে, অমনি প্রলয় উপস্থিত হইবে ও তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া অপর পরমাণু (atom) রূপে আবির্ভূত হইবে।

এইরূপ কয়েকটী পরমাণু (atom) একত্র মিলিয়া যখন ঘনীভূত হয়, তখন উহাদের ঐ অবস্থাকে অণু বা মলিকিউল (molecule) বলা হয়। অণু (molecule) সকল পৃথিবীস্থ জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি জড় পদার্থের স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশ মাত্র। ইহাদেরই ঘনীভূত অবস্থার তারতম্যানুসারে জড় পদার্থ সকল বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন আকার ধারণ করে।

শূন্যময় আকাশে এই জড় পদার্থ সকল প্রথমে উত্তপ্ত বাষ্পীয় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া তেজ ও আলোকরশ্মি বিকীরণ করিতে থাকে। ক্রমশঃ উহাদের তেজ হ্রাস হইয়া তরল ও পরে কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের এই ক্রমবিকাশের পূর্ব্বাবস্থাকে নীহারিকাময় (nebulous) অবস্থা বলা হয়। এই নীহারিকা বা নেবুলা

(nebulæ) রাশির কিয়দংশ হইতে সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশে বিক্ষিপ্ত নীহারিকারাশি কোন একটী কেন্দ্রে ঘনীভূত হইয়া সূর্য্য রূপে উৎপন্ন হইয়াছে ও অনবরত তাপ বিকিরণ করিতেছে। অতি দূরস্থ অন্যান্য নীহারিকা বা নেবুলা (nebula) রাশি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ঐ প্রকারে বিবিধ গ্রহ-নক্ষত্রাদিরূপে আকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। স্পেকট্রস্কোপ (spectroscope) নামক যন্ত্র সাহায্যে দেখা গিয়াছে, অনেক নেবুলা রাশি কতকগুলি নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ অবস্থায়, আবার কতকগুলি এখনও ঘনীভূত না হইয়া তাহাদের আদি উজ্জ্বল বাষ্পময় অবস্থায় আকাশে বর্ত্তমান আছে। ইহাদের উজ্জ্বলতার কারণ পূর্ব্বে যে বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট দুই প্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির কথা বলা হইয়াছে এই দুই শক্তির পরস্পর সংঘর্ষ।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও উত্তপ্ত তরল অথবা বাষ্পীয় আকারে আছে। ইহার উপরিভাগ হইতে অনবরত তাপ বিকীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে আরম্ভ হইলে সঙ্কুচিত হইয়া ইহার পৃষ্ঠদেশ অসমান ও কঠিন হইয়াছে। পৃথিবী প্রথমে সূর্য্য হইতে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া যে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, ঐ শক্তিই পরে উদ্ভিদ ও জীবগণের প্রাণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। একই শক্তি অবস্থা ভেদে জড় পদার্থে গতি, উত্তাপ, আলোক ও রাসায়নিক শক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার ইহাদের কোন একটা শক্তি অবস্থা ভেদে অন্য প্রকার শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। এই শক্তিই অবস্থা ভেদে সজীব পদার্থে অনুভব শক্তি (sensation) ভাবুকতা (emotion) ও চিন্তাশক্তি (thought) রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন একই জড় পরমাণু কখনও একটী গোলাপ ফুলের আকার গ্রহণ করিতে পারে, আবার কখনও জলাশয়ে শৈবালরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই প্রকার একই জড় শক্তি কখনও

আকাশে বিজলী রূপে প্রকাশ পাইয়া সৌধ-চূড়ায় বজ্র রূপে পতিত হইতে পারে, কখনও বা মাতৃ-হৃদয়ে অপত্য-স্নেহ রূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্য পান করায়। এই শক্তি কি এবং কোথা হইতে আসিল তাহা আমরা জানি না এবং পদার্থ-বিজ্ঞান অদ্যাপি তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

এইবার আমি জীবদেহের উৎপত্তির বিষয় বলিব। যাহার প্রাণ আছে তাহাকে চেতন পদার্থ বলা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে অচেতন পদার্থ হইতেই চেতন পদার্থের উৎপত্তি। ইহা মানিয়া লইলে সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থের কোথায় পার্থক্য তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। গতিশক্তি ও পোষণ ক্রিয়া (movement and growth) যদি সজীবের লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে, কোন কোন নির্জ্জীব পদার্থেও অবস্থা বিশেষে উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিউডক (Ludock) এবং লোয়েব (Loob) নির্জ্জীব পদার্থের উপর রাসায়নিক ও জড় শক্তির ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা ঠিক সজীব পদার্থ উৎপন্ন করিতে না পারিলেও সজীব পদার্থের কোনও কোনও লক্ষণ তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যে প্রকার ক্রমবিকাশ (evolution) প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীস্থ নির্জ্জীব পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রকার ক্রমবিকাশ দ্বারা নির্জ্জীব পদার্থ হইতে প্রথমে অতি সূক্ষ্ম জীবাণুসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। পুরাতনের উপাদান লইয়া নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নির্জীব পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক অবস্থায় সজীব পদার্থে পরিণত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যায়। যৎ কালে

এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন পৃথিবীর উপরিভাগে মৃত্তিকা, জল ও বায়ুর উৎপত্তি হইয়া উহা জীবোৎপাদনের উপযোগী হইয়াছিল। সেই সময়ে জল ও উত্তাপের সাহায্যে কোন কোন নির্জীব পদার্থের মিশ্রণে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া লালার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। উহাতেই সর্ব্বপ্রথম জৈবিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন যে সায়ানোজেন (cyanogen) নামক যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে যে সকল মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদের সহিত সজীব পদার্থ সকলের অতিনিকট সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রচণ্ড উত্তাপ প্রয়োগ ভিন্ন সায়ানোজেনের উৎপত্তি হইতে পারে না সুতরাং জৈবিক পদার্থ সকল পৃথিবীর আলোকময় উত্তপ্ত অবস্থাতেই উৎপন্ন হইয়া ছিল এরূপ অনুমান করা তাঁহারা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। এই লালার ন্যায় পদার্থ হইতেই সেল্ (cell) বা জীবকোষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই cell বা জীবকোষই পরে জীবাণুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেলের (cell) অভ্যন্তরস্থ পদার্থকে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলা হয়। এই অতি সূক্ষ্ম লালাবৎ পদার্থ (Colloid form) অন্যান্য পদার্থ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে পুষ্ট হইলে তাহা আপনা আপনি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি সেলের উৎপত্তি হয়। তাহারা আবার ঐরূপে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া ক্রমশঃ অসংখ্য সেলের উৎপত্তি করে। এই সেল হইতেই সামান্য বেঙের ছাতা (fangus) হইতে বৃক্ষাদি উদ্ভিদ সকলের ও সামান্য কীটাণু হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গাদি জীব সকলের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এইবার আমি পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম ও লালাবৎ পদার্থ হইতে জীব ও উদ্ভিদ শরীরের প্রধান উপাদান জীবকোষ বা সেল (cell) নামক পদার্থের উৎপত্তির বিষয় বলিব। প্রত্যেক জীবদেহে এক বা ততোধিক সেল বহু

বা বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত থাকে। উহাদের আকার কোনটী বা এত ছোট যে একটি বিন্দুমাত্র কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। অতি ক্ষুদ্র সেলগুলির উপাদান সকল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয় না। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সেলগুলির অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সকল যন্ত্র সাহায্যে জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি সেলের অভ্যন্তরস্থ উপাদান সকলকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) বলা হয়। ইহা জলবৎ এক প্রকার তরল পদার্থে নির্ম্মিত এবং ইহার উপরিভাগ অতি পাতলা একটী আবরণীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই প্রোটোপ্লাজমে (Protoplasm) অনেক সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ (granules) থাকে। এই সকল অর্ব্বুদের কতকগুলি জীবের পাকস্থলী, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয় সকল গঠন বিষয়ে সাহায্য করে, অপর কতকগুলি সেলের (cell) খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ও তাহাদের পোষণ কার্য্যের সহায়তা করে। সেল সকলের অভ্যন্তরে মধ্যবিন্দু বা নিউক্লিয়াস (nucleus) নামে একটি গোলাকার পদার্থ থাকে। ইহার আকৃতি সেলের আকৃতি অনুযায়ী ছোট বড় হইয়া থাকে। ১নং চিত্র দেখ।

অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদ বা জীবদেহে একটিমাত্র সেল থাকে। তাহা বাহ্য বস্তুর সংস্রবে থাকিয়া তাহা হইতে আহার গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিখণ্ডিত হয়; ঐ খণ্ডিত অংশগুলি আবার দ্বিখণ্ডিত হয়। এইরূপে অসংখ্য সেলের (cell) উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সেল সকলই সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন উদ্ভিদ বা জীবের বংশ রক্ষা ও বংশ-বিস্তার করিতে থাকে। উচ্চতর স্তরের জীবদেহে অনেকগুলি সেল থাকে তাহারা ঐসকল জীবের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল গঠন করে। জীবন ব্যাপারের পৃথক পৃথক কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহারা জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। অম্লজান (oxygen), জলজান বা উদজান

(hydrogen), যবক্ষার জান (nitrogen) ও অঙ্গার বা (carbon) নামক পদার্থ সকলের এক প্রকার বিশিষ্ট মিশ্রণে তন্মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়া এই জীবকোষ বা সেল নামক পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবদেহে এই সেল্ সকল বাহির হইতে সর্ব্বদা নূতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন পরিপূর্ণ হয় তখন তাহা খণ্ডিত হইয়া নূতন সেল (cell) সকল উৎপন্ন করিয়া জীবদেহের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। এইরূপ করিতে করিতে যখন তাহাদের বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যায়, তখন জীবের মৃত্যু হয়। জীব এইরূপে মৃত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত শারীরিক ক্রিয়া অক্ষয় রাখিবার জন্য নূতন জীব সৃষ্টির উপায় রাখিয়া যায়। ইহাকে reproduction বা জীবের বংশবৃদ্ধি বলা হয়।

এইবার আমি জীবের বংশবৃদ্ধির কথা কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রত্যেক জীব একটি জীবকোষ বা cell হইতে তাহার দেহ গঠন আরম্ভ করিয়া থাকে। অবশেষে উহা যে জাতীয় জীব-কোষ তাহার বৈশিষ্ট্য অনুসারে কম বেশী নানাপ্রকার জটিলতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করে। এই সকল জীবকোষ জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হইয়া পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি দেহ-যন্ত্র সকলের কার্য্য করণের সহায়তা করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জীবকোষ জীবের বংশ-বৃদ্ধির জন্য পিতার ও মাতার দেহস্থ স্থান বিশেষে শুক্রকীট sperm cell ও ডিম্বকোষ ovum cell রূপে অবস্থিতি করে এবং সময় বিশেষে পিতার শরীর হইতে মাতার শরীরে প্রবেশ করিয়া দুইটি জীবকোষ একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের স্বভাব বিশিষ্ট একটি নূতন জীবকোষ রূপে পরিণত হয়। পরে উহা মাতার গর্ভে থাকা কালীন গর্ভ হইতে রসরূপে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইলে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ২টী জীবকোষ (cell) হয়। পরে তাহারাও আবার ঐরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়া বহু জীবকোষ (cell) সকলের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে জীবদেহের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিয়া মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের দেহ গঠন সম্পাদন করে এবং যথাসময়ে মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হয়। প্রত্যেক জীবের বহির্জ্জগতের সহিত নানা প্রকার সংশ্রব থাকায় তাহার ফলে জীবগণের বিশেষত্ব লাভ ঘটে। খাদ্য, জল, বায়ু ইত্যাদি দ্বারা তাহাদের দেহ মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া এবং তাপ ও আলোক গ্রহণের দ্বারা জড় শক্তির (physical) ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে কথন কথন পিতা মাতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবন সংগ্রাম (struggle for existence) জীবের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। জীব সকল পৃথিবীতে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে চায় না। নিজ নিজ সুবিধা বা খাদ্যের জন্য অপরের সহিত অনবরত লড়াই করিয়া থাকে। আবার তাহাদের মধ্যে পরস্পর সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি ও অপত্যস্নেহ দেখা যায়। অবস্থা বিশেষে পড়িয়া কোন কোন জীবের অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে; আবার কোন কোন জীব বা একেবারে লোপ পাইয়া যায়। ইহা ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ (heredity) জীবের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা এক জাতীয় জীবের বিশেষত্ব বংশ-পরম্পরা ক্রমে রক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃ মাতৃ জীবকোষের মিলনে একটি নূতন জীবকোষ গঠিত হইয়া জীবের বংশ-রক্ষা হইয়া থাকে। পিতা ও মাতার জীবকোষের সার বস্তু (nucleus) এইরূপে একত্র মিলিত হওয়ায় উভয়েরই বিশেষত্ব নবোৎপন্ন জীবে কিছু কিছু দেখা যায়। অনেক সময় এমন দেখা যায়—কোন কোন স্থলে এক পুরুষ বাদ দিয়া পিতামহ বা প্রপিতামহের বিশেষত্ব সন্তানে লক্ষিত হয়।

এক জাতীয় জীবের বিশেষত্ব কি প্রকারে তাহার সন্ততিতে সংক্রামিত হয় তাহা বলিতেছি। মনে করুন একটি পুংজাতীয় জীবকোষ স্ত্রীজাতীয় ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত (fertilised) হইল। উহা পিতা ও মাতা উভয়েরই বিশেষত্ব কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ গুণবিশিষ্ট এক নূতন জীবকোষ রূপে উৎপন্ন হইল। মাতৃগর্ভে ঐ জীবকোষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটী হইল। ইহাদের প্রত্যেকটিতে এই নূতন জীবকোষের বিশিষ্ট গুণ সকল বর্ত্তিল। উহারা আবার দ্বিখণ্ডিত হইল। এইরূপে ক্রমাগত খণ্ডিত হইয়া জীবদেহে অসংখ্য জীবকোষের উৎপত্তি হইল। ইহাদের প্রত্যেকেই আদি জীবকোষের গুণবিশিষ্ট হইল। পরে দেহের মধ্যে পৃথকীভুত (differentiated) হইয়া জীবদেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেহস্থ যন্ত্র বিশেষের আবশ্যক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, কতকগুলি জীবকোষ যাহারা জীবের বংশ-বৃদ্ধির জন্য জীবদেহের স্থান বিশেষে রক্ষিত হইল তাহারা সন্তান উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্তানে জীবের নিজ নিজ স্বভাব সংক্রামিত হইয়া থাকে।

আমি ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; যথা—

১। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকগণের মতে সজীব পদার্থ নির্জ্জীব পদার্থ হইতে ক্রমবিকাশ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

২। প্রত্যেক জীবদেহ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জীবদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। প্রাণ শক্তির আদি উৎপত্তির বিষয় আমরা কিছুই জানি না। সম্ভবতঃ বিভিন্ন জড় পদার্থের কোন বিশিষ্ট প্রকার মিশ্রণ হইলে তন্মধ্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় উহা তাহারই ফল।

৪। প্রত্যেক জীবদেহের উপাদান একটী মাত্র জীবকোষ (Cell) অথবা অনেকগুলি জীবকোষের সমষ্টির বহু এবং বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ।

৫। একটীমাত্র জীবকোষবিশিষ্ট জীব-সকল তাহাদের দেহের উপযোগী খাদ্য পরিপাক করিবার উপযুক্ত কোনও পৃথক দেহ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত পুষ্টিলাভ করে। অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদ সকল ও এমিবা (Amœba) প্রভৃতি কীটাণু সকল একটী মাত্র জীব-কোষ-বিশিষ্ট।

৬। অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের উদ্ভিদ ও জীব সকল বহু কোষ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের দেহের পোষণ জন্য কতকগুলি জীব-কোষ পৃথক ভাবে থাকিয়া খাদ্যাদি পরিপাক করে। উচ্চস্তরের জীব-গণের দেহের গঠন তাহাদের নানা প্রকার আবশ্যক বশতঃ অত্যন্ত জটিল। তাহাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত জীবকোষ সকল তাহাদের পোষণ জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। খাদ্য আহরণ জন্য গতি-শক্তির আবশ্যক হওয়ায় সঙ্কোচক পেশী সকল (Contractile muscles) এবং তাহা হইতে হস্ত পদাদির উৎপত্তি, খাদ্য পরিপাক জন্য পাকস্থলীর উৎপত্তি, দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত জীবকোষ (Cell) সকলের আদান প্রদান (Communication) জন্য স্নায়ুমণ্ডলীর (nervous system) উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে জীবদেহে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের ও মস্তিষ্কের উৎপত্তি হইয়াছে।

যে মহাশক্তির ক্রমবিকাশ দ্বারা এক বিন্দু আঠার মত প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) হইতে হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ও ডারউইন (Darwin) এর মত মনীষিগণের এবং বুদ্ধ ও কপিলের ন্যায় মহাপুরুষ সকলের উদ্ভব হইতে পারে এবং আকার-বিহীন ইথার (Ether) নামক পদার্থ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি সমন্বিত এই

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইতে পারে, সে শক্তি অনন্ত কাল হইতে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে ও চিরকাল করিতে থাকিবে। এই শক্তিকেই আর্য্য ঋষিগণ উপনিষদে পরমাত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে মানব! তোমার ভবিষ্যৎ চরমোন্নতি প্রাপ্তি সম্বন্ধে কখনও নিরাশ হইও না। এই জগতে তোমরা কেবল তোমাদের নিজকে লইয়া আছ তাহা নহে। তোমরা সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার ক্রম বিকাশের সহায়ক। পরমাত্মার ক্রম বিকাশ সাধনজন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তোমাদের মন ও চিন্তাশক্তি এবং তাহা হইতে অহং জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। মানব যখন তাহার আদি বানর অবস্থা হইতে ক্রম বিকাশ রূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান ক্ষমতাশালী ও সামাজিক জীবে পরিণত হইয়াছে, তখন ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কালে আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বিজ্ঞান চর্চ্চা, শিল্প, কলা, সুনীতি, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলকে এমন ভাবে গঠিত কর যাহাতে ক্রমবিকাশ (evolution) রূপ ঐশ্বরিক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কালে সকলেই শ্রেষ্ঠ মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে।

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর

২

এই পৃথিবী ও জড়জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে; এই বিশ্ব-সৃষ্টির আদিতে কেবল মাত্র অসীম শূন্যময় অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ ছিল। সম্প্রতি আইনষ্টিন নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতে এই আকাশ অসীম হইলেও অনন্ত-বিস্তৃত নহে। তিনি এই অদ্ভুত রহস্যময় তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। তখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বায়ু, জল, মৃত্তিকা কিছুই ছিল না। তৎকালে এই অনন্ত-বিস্তৃত আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; কারণ তখন আলোকের আবির্ভাব হয় নাই। বৈদিক ঋষি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে জগতের এই অবস্থার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য মূল সূত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজোনোব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥"

বঙ্গানুবাদ—"যাহা নাই তাহা তখন ছিল না; যাহা আছে, তাহাও "ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থানও ছিল না।

"আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম
"ও গভীর জল কি তখন ছিল?

"তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ "ছিল না। কেবল সেই এক অদ্বিতীয়, বায়ু ব্যতীরেকে আত্মামাত্র "নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই "ছিল না।

"সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন- "বর্জ্জিত ও সমস্তই সলিলবৎ তরল ভাবাপন্ন (fluid condition) "ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যা "(evolution) প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।"

জগতের এই অবস্থার কোন এক সময়ে এই অনন্ত আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কণার (electric particles) আবির্ভাব হইল। এই বিদ্যুৎকণা হইতেই আদিভূত ৯২টী পরমাণু (atoms) সকলের ও ঐ পরমাণু সকল হইতেই অণু (molecules) সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং এই অণু হইতেই জগতস্থ যাবতীয় সজীব ও নির্জীব পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিদ্যুৎকণা সকল উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল।

এই বিদ্যুৎকণা সকল দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের একটীকে পুরুষ (positive) ও অপরটীকে স্ত্রী (negative) নাম দিয়াছেন। ইহাদের স্পন্দন ও গতি হইতেই সর্ব্বপ্রথম আলোকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

কোটী কোটী বৎসর এই ভাবে অতীত হইয়া গেলে অসীম শূন্যময় আকাশের স্থানে স্থানে ঘটনাক্রমে কতকগুলি বিদ্যুৎকণা পুঞ্জীভূত হইয়া অধিকতর আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের কেন্দ্রাভিমুখে

অনতিদূরস্থ বিদ্যুৎকণা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্ত আকাশে এমন কত ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের চারিদিক বেষ্টন করিয়া কত গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকলের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী তাহাদেরই আমরা আকাশে তারকা ও নক্ষত্র রূপে দেখিতে পাই। কোন একটী স্থানে একটী আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া যদি উহা এক সেকেণ্ড বাদে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইলে ঐ আলোকের উৎপত্তি-স্থান পৃথিবী হইতে একলক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে আছে বুঝিতে হইবে কারণ আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে যে নক্ষত্রগুলি আছে, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম যে আলোক উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ঐ বেগে ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে ৯ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল। এই হিসাব হইতে অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র কতদূরে আছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

আমাদের এই সূর্য্য প্রথমে একটী পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎকণার সমষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ও তাহার কেন্দ্রাভিমুখে নিকটবর্ত্তী বিদ্যুৎকণা সকল আকর্ষণ করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া তাহার পরিমাণ (mass) বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সকল বিদ্যুৎকণা গতি ও বেগ বশতঃ তাপ-বিশিষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ বাষ্পাকারে ৯২ প্রকার পরমাণু (atoms) রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাই আমাদিগের সূর্য্যের উৎপত্তির ইতিহাস। যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সূর্য্য এই ভাবে থাকার পর কোন এক সময়ে অনন্ত আকাশে যে সকল নক্ষত্র রাশি পরিভ্রমণ করিতেছে,

তাহাদের মধ্যে কোন একটী দৈবক্রমে সূর্য্যের কোল ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যখন সে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন তাহার আকর্ষণে সূর্য্যের উপরিভাগের যে অংশ তাহার নিকটবর্ত্তী ছিল তাহা চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া সমুদ্রের জল যেরূপ স্ফীত হয় সেইরূপ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাষ্পময় সূর্য্যের কিয়দংশ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই নক্ষত্রের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বিচ্যুত বাষ্পপিণ্ড সকল তাহার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই ঐ নক্ষত্র-তারকা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং উহারা তাহার নাগাল না পাইয়া পুনরায় সূর্য্যে ফিরিয়া না যাইয়া গতিবিশিষ্ট হইয়া শূন্যমার্গে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই বাষ্পপিণ্ড সকলের মধ্যে একটী হইতেছে আমাদের এই পৃথিবী! ভাগ্যিস্ এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাই আমাদের পৃথিবী এবং তাহার উপর আমরা! তৎকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের ১০ লক্ষ ডিগ্রী বা ততোধিক ছিল। কোটী কোটী বৎসর তাপ বিকিরণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া এক্ষণে উহা বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৯২টী পরমাণু যাহা প্রথম বাষ্পাকারে ছিল, তাহাই রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action) ও জড়শক্তির ক্রিয়া (physical force) প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন কঠিন স্তর সকলে ও উপরস্থ জল ও বায়ুতে পরিণত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, আদিতে যে জড় ও জড়শক্তি শূন্যময় আকাশে যে বিদ্যুৎকণারূপে এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল এই জড় ও জীবজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদেরই ক্রমবিকাশ (evolution) মাত্র। মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি সমন্বিত মানবদেহও ঐ উপাদান হইতে

ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। এই জড় ও শক্তি অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে এবং উহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মে কার্য্য করিয়া এই জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই দুইটী অবিভাজ্য ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত, মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বাক্ ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্তই যদি জড় ও জড়শক্তির বিকাশ তাহা হইলে জীবের অনুভূতি, প্রাণ, আত্মা ও জ্ঞান (consciousness) কোথা হইতে হইল? ইহাও কি জড় ও জড়শক্তির বিকাশ? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন দেশ (space) কাল (time) জড় ও জড়শক্তি (matter and its inherent force or energy) এই তিনটী সজীব ও নির্জীব জগতের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে আর একটা জিনিষ আছে তাহা প্রাণ বা আত্মা (life or soul)। এই আত্মা জড়বিজ্ঞানের অতীত। কারণ ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে; ইহাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়। ইহা অনুভূতি-সাপেক্ষ,—অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রাসায়নিক মিশ্রণ বা পরীক্ষা যন্ত্র (test tube) বা অঙ্কশাস্ত্র ইহাদের অধিকারের বহির্ভূত। এই আত্মাই জীবে প্রাণ রূপে অবস্থিতি করে এবং ইহা হইতেই জীবের অহং জ্ঞানের (egotism) উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন জড়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয় বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, হইতে পারে জড় ও জড়-শক্তির ক্রমবিকাশ বশতঃ এই জড় ও জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু প্রভেদ আছে। মানবদেহ সাধারণ জীবদেহের উন্নত অবস্থা হইলেও প্রভেদ, এই যে, নিম্নশ্রেণীর জীবের অনুভূতি থাকিলেও তাহাদের অহংজ্ঞান (egotism)

নাই। অহংজ্ঞান কেবল মানবেরই আছে। এই অহংজ্ঞান হইতেছে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর যিনি এই বাস্তব জগতের অন্তরালে অধিষ্ঠান করেন। তাঁহারই অভিব্যক্তি বা তাঁহারই ইচ্ছায় বিদ্যুৎকণাই বল, বা অণু পরমাণুই বল, যাহা কিছু জগতের উপাদান, সমস্তই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদান্তমতে এই পরমাত্মা বা পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনি অনন্ত আকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রত্যেক অণু-পরমাণুর ভিতর বিদ্যমান আছেন।

এই আত্মা যখন জীবের দেহ মধ্যে থাকেন, তখন ইঁহাকে জীবাত্মা বলা হয়। এই পরমাত্মা বা পুরুষের প্ররোচনায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই সচরাচর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি।

"প্রক�ৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥
কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
"হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" গীতা।

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নিরাকার পরমাত্মায় নিদিধ্যাসন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। ভক্তিপ্রবণ হিন্দুগণ এই প্রকৃতি ও পুরুষকে কেহ বা নানা দেবদেবী রূপে কেহ বা মনুষ্য বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ জারমান বৈজ্ঞানিক হেকেল বলেন, মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের জড় ও জড় শক্তি হইতে পৃথক এক আত্মা (sonl) বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করা ভ্রমাত্মক। তিনি বলেন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের এই আত্মা বা

ঈশ্বর কোথায় আছেন, এই জগতের মধ্যে না বাহিরে? ইহার আকার কিরূপ? যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে বায়ুর ন্যায় কি বাষ্পের মত? যদি তেজোময় হন তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে তাঁহার তেজ আকাশে বিকীর্ণ হইতে থাকায় এতকালে নিশ্চয় বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে ঈশ্বরকে ইচ্ছা ও মন বিশিষ্ট এবং তাঁহাতে দয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রভৃতি মানুষের গুণ সকল পূর্ণমাত্রায় আছে এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার কার্য্য সকল মানুষের কার্য্যের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে; অথচ তিনি নিরাকার এবং সর্ব্বত্র আছেন এরূপও বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাষ্পময় মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীববিশেষ ভিন্ন অন্য কি কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি ঈশ্বর শক্তিবিশেষ হন তাহা হইলে এই শক্তির আধার কি? মস্তিষ্কাদি দেহযন্ত্র ব্যতীরেকে কেবল শক্তিমাত্রের কথনও মানুষের মত মন, বুদ্ধি, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি গুণ সকল থাকিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, তাপ, আলো, রাসায়নিক ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্রিয়া (electricity and magnetism) এক গতি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারভেদ। যন্ত্রাদি সাহায্যে আমরা ইহার কোন একটীকে ইহাদের অপরটীতে পরিণত করিতে পারি এবং উহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইতে পারি যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন করায় ঐ শক্তির কিছু মাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় নাই—রূপান্তর হইয়াছে মাত্র।

এই জগতের যাবতীয় জড় ও জড়শক্তির সমষ্টি চিরকাল একই আছে ও থাকিবে—উহা যে কোন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত হউক না কেন। এই জড় ও জড়শক্তির পরিবর্ত্তন গতি ও বিশ্রামের উপর জগৎ চলিতেছে। জড়ের গতি ও বিশ্রাম উভয় অবস্থাতেই শক্তি তাহাতে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে। গতি অবস্থায় শক্তি কার্য্যকরী হয় ও বিশ্রাম অবস্থায় ঐ শক্তি রুদ্ধ থাকে মাত্র। উহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, জীবের মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়া দেখা যায় তাহা বিভিন্ন জড় পরমাণুর গতি ও স্পন্দন বশতঃ তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। মস্তিষ্ক ও জটিল স্নায়ুমণ্ডলীই জীবের মন ও অহং জ্ঞানের কারণ। ঔষধাদির দ্বারা অথবা পীড়াবশতঃ মানবের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্তম্ভিত হইলে তাহার মন ও অহং জ্ঞান থাকে না। মস্তিষ্কস্থ পরমাণু সকলের স্পন্দন ও তাহাদের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়াই মন ও অহং জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতীরেকে পৃথক্‌ভাবে মন ও অহং-জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কল্যকার আমি ও আজকের আমি, শিশু আমি ও বৃদ্ধ আমি, ঠিক এক আমি নই। আমাতে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর বা ভ্রূণের আমিত্ব-বোধ থাকে না, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার আমিত্ব জ্ঞান হয়। স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তির উপর আমিত্ব-বোধ অনেকটা নির্ভর করে। অতি বৃদ্ধ অবস্থায় যখন স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তির হ্রাস হয় তখন আমিত্ব-বোধও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং আমিত্ব-বোধ কোন অনৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া হইতে হয় না; ইহা সাধারণ নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফল। বর্ব্বর ও অসভ্য অবস্থায় মানবের আমিত্ব-বোধ ভাল রকম প্রস্ফুটিত হয় না। সভ্যতার ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত মানবের আমিত্ব-বোধ ক্রমশঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়। এই আমিত্ব-বোধ জীবের ক্রমবিকাশ (evolution) রূপ নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফল।

যে অপরিবর্ত্তনীয় অত্যদ্ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জড়পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার পশ্চাতে যবনিকার অন্তরালে আর কিছু আছে কি না, যাঁহাকে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণ করুণা, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি মানুষিক গুণবিশিষ্ট অথচ নিরাকার কল্পনা করিয়া ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন সেই কিছু বাস্তবিক কি পদার্থ তাহা

আমরা নিশ্চয়রূপে জানি না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যাহা জানা যায় না বা ধরা ছোঁয়া যায় না, যাহার প্রমাণ নাই এবং যাহা ধরিয়া লওয়ার আবশ্যক করে না এরূপ কল্পিত পদার্থের পশ্চাতে অনুধাবন করিয়া লাভ কি? আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহার নিশ্চয়রূপে সন্ধান পাইয়াছি, অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি (matter and force), ও যাহা অনন্ত কাল হইতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহারই গবেষণা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই জগৎ বাস্তব পদার্থ। বাস্তব পদার্থ-ই জ্ঞেয়; অবাস্তব পদার্থ কখন জ্ঞেয় হইতে পারে না। ঈশ্বর যদি বাস্তব পদার্থ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা হয় তো কালে আমরা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিব। এই পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম-মত প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই তুল্যভাবে মিথ্যা ও অযৌক্তিক, কবিকল্পনাসম্ভূত ও বংশপরম্পরাগত শোনা কথা মাত্র। যুক্তিহীন কুসংস্কার, ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মমত সকল জগতে প্রচার করিয়া সরল-বিশ্বাসী জনগণের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত মারামারি, কাটাকাটি, ভীষণ যুদ্ধ ও নরহত্যা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই ধর্ম্মের নামে। কত লক্ষ লক্ষ লোক নিজ সমাজস্থ প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করায় আত্মীয় স্বজন কর্তৃক নির্য্যাতিত হইয়া গৃহত্যাগী, এমন কি দেশত্যাগী পর্য্যন্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে যাহা সত্য শিব ও সুন্দর তাহাই ঈশ্বর—তাহাই ভগবান্—"সত্যং শিবং সুন্দরং"। বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞানই সত্য; যাহা জগতের হিতকর তাহাই শিব ও যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ও মনের প্রীতিদায়ক তাহাই সুন্দর। বিজ্ঞানচর্চ্চা, জগতের হিতকর কার্য্য সকল করা এবং শিল্প ও কলাদির অনুশীলন করা, যে প্রাকৃতিক নিয়মে জগতের কার্য্য হইতেছে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা ও নৈতিক-জীবন যাপন করাই ধর্ম্ম ও ঈশ্বরোপাসনা।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা

পরমাত্মা ও জীবাত্মা

৩

খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মমতে মানুষের আত্মা অমর ও অভৌতিক (spiritual) পদার্থ। উহা মানবের জীবদ্দশায় তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পর কবর মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং শেষ বিচারের দিন কবর হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে হাজির হইবে। ঈশ্বর পুণ্যাত্মাগণকে স্বর্গে ও পাপাত্মাগণকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে আত্মা ঐ প্রকার পদার্থ এবং মৃত্যুর পর দেহের সহিত কবর মধ্যে আবদ্ধ থাকে ; কিন্তু শেষ বিচারের দিন নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া (কিরূপ দেহ তাহা জানা যায় না) খোদার নিকট উপস্থিত হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ ও পুণ্যের বিচার করিবেন। যাঁহারা জীবদ্দশায় মুসলমান-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও নিয়মিত নমাজাদি ও কোরাণের বিধি সকল পালন করিয়াছেন, খোদা তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিবেন ; সেখানে তাঁহারা উৎকৃষ্ট পানীয় ও সুস্বাদু খাদ্য সকল পান ও ভোজন ও সুন্দরী পরীগণের সহিত বিহার করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিবেন। এবং যাঁহারা উক্তরূপ কার্য্য সকল করেন নাই, অথবা কাফের অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, খোদা তাঁহাদিগকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। হিন্দু-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে আত্মা অজর অমর ও বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম। উহা মানবের স্থূল দেহমধ্যে অবস্থান করে এবং মৃত্যুর পর দেহ হইতে বাহির হইয়া আকাশে উত্থিত হয়। পরে ইহজন্মের কৃত পাপ ও পুণ্য অনুসারে কিছুকাল নরকে অথবা স্বর্গে বাস করে এবং তথায় সুখ ও দুঃখ ভোগ

করিয়া পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইলে তাহার সূক্ষ্ম-শরীর ক্ষীণ হইয়া লিঙ্গ-শরীর প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গ-শরীর প্রাপ্তির পর তাহা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যাত্মাগণ সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পাপাত্মাগণ কদাচারী অধার্ম্মিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা বিষয়-বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও যোগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; তাঁহারা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যান।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে আত্মার স্বরূপ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে আত্মা বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ অথবা মনের ন্যায় অভৌতিক পদার্থ, যাহাকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, অথচ উহা আকাশে বিচরণ করিতে পারে; দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট মানবের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে উহা এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারে ও ব্যক্তি-বিশেষের পুত্র-কন্যা-রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

বর্ত্তমান কালে পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুদূর অতীত কালের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মা সম্বন্ধে উক্তরূপ অযৌক্তিক ও মন-গড়া সিদ্ধান্ত সকল করিয়াছিলেন।

পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলন দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমরা জানিতে পারিয়াছি; যথা—

১। জগতে একমাত্র শক্তি (energy) ও তাহার আধার পদার্থ (substance বা matter) বিদ্যমান আছে। শক্তি ও পদার্থ এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে উহারা কখনও পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। কেহ পরমাণুকে (atom) কেহ বা ইথর্‌কে (ether) কেহ বা ইথর্‌ অপেক্ষা

আরও কোন সূক্ষ্ম পদার্থকে (যাহার প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি জানা যায় নাই) এই শক্তির আধার বলিয়া বিবেচনা করেন। হিন্দুদিগের দর্শন-শাস্ত্র যাহাকে পঞ্চভূতের তন্মাত্রা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এই পদার্থ অনেকটা সেই প্রকার।

২। পদার্থ অবলম্বন করিয়া শক্তি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে; এমন কোন স্থান খালি নাই যেখানে উহা নাই।

৩। শক্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন হইয়া অনাদিকাল হইতে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। ইহাই তাহার ধর্ম্ম বা প্রকৃতি। জগতের যাহা কিছু দৃশ্য (phenomena), পদার্থের উপর শক্তির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন।

৪। জগতে শক্তির যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিকাশ হউক না কেন তাহাদের সমষ্টি ও জগতস্থ যাবতীয় পদার্থ সকলের সমষ্টি চিরকাল একই থাকে।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, অঙ্গারক (Carbon), জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষার জান (Nitrogen) ইহারা সকলে জীবনহীন অচেতন পদার্থ। ইহাদের মধ্যে অঙ্গারক ও অম্লজান কোন বিশেষ মাত্রায় ও অবস্থায় মিশিত হইলে তাহা হইতে অঙ্গারীয় অম্ল (Carbonic acid), জলজান ও অম্লজান হইতে জল, যবক্ষার জান ও অন্যান্য কয়েকটী আদি ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া যবক্ষার লবণ (Nitrogenous salts) সকল উৎপন্ন হয়।

এই সকল নূতন মিশ্র পদার্থ যে সকল আদি ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তাহারা সকলেই নির্জীব পদার্থ। কিন্তু যখন তাহারা কোন অবস্থা-বিশেষে একত্র হয় তখন তাহাদের মিশ্রণে এমন একটী জটিল

পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহাকে আমরা (protoplasm) প্রটোপ্লাজম্ বলি এবং এই প্রটোপ্লাজম্ই জীবনরূপ দৃশ্য (phenomena), প্রদর্শন করে।

"Carbon, Oxygen, Nitrogen are all lifeless bodies; of these Carbon and Oxygen unite in certain proportions and under certain conditions to give rise to Carbonic acid; Hydrogen and Oxygen produce water; Nitrogen and other elements give rise to Nitrogenous salts. These new compounds like the elementary bodies of which they are composed are lifeless. But when they are brought together under certain conditions they give rise to still more complex body protoplasm, and protoplasm exhibits phenomena of life."

—Huxley's Lectures and Essays.

নির্জীব পদার্থে যে সকল মৌলিক উপাদান দৃষ্ট হয় সজীব পদার্থে তদতিরিক্ত অন্য কোন মৌলিক উপাদান দৃষ্ট হয় না। সজীব পদার্থের মৌলিক উপাদান সকলের এক প্রকার বিশিষ্ট ভাবে মিশ্রণে এলবুমিনয়েড (albuminoid) শ্রেণীর প্রটোপ্লাজম্ (protoplasm) নামক মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতেই সজীব পদার্থে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

উক্ত এলবুমিনয়েড নামক পদার্থের পরমাণু সকলের পরস্পর বিনিময় বশতঃ যে রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই সজীব পদার্থের প্রাণ। অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান এবং গন্ধক এই কয়েকটী মৌলিক পদার্থের সহিত অঙ্গারক (Carbon) মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে

এলবুমিনয়েড্ নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। অঙ্গারক সহযোগে প্রটো-প্লাজম্ নামক যে মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার জটীল গঠন, চঞ্চলতা ও আঠাবৎ ঘনত্ব বশতঃ উহা অঙ্গারক বিহীন অন্যান্য মিশ্র পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র।"

"No other elements are found in organic bodies than those of the inorganic bodies.

The combination of elements which are peculiar to organism and which are responsible for their vital phenomena are compound protoplasmic substance of the group of albuminoids.

Organic life itself is a chemico-physical process based on the metabolism (or interchange of materials) of these albuminoids which is a combination of the elements Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Sulphur with Carbon.

The protoplasmic compounds of Carbon are distinguished from most other chemical combinations by their very intricate molecular structure, their instability and their jelly like consistency.

—E. Haeckel.

মানব দেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিৎ (biologist) পণ্ডিতগণ বলেন, উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের দেহ এবং সর্ব্বোচ্চ জীব মানবের দেহ আদিতে একটীমাত্র ক্ষুদ্র জীবকোষ (cell) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক পুরুষের অণ্ডকোষে শুক্র (sperm) নামক এক প্রকার তরল

পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। ঐ তরল পদার্থ মধ্যে অসংখ্য শুক্রকীট (spermatozoa) সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। স্ত্রীলোকের জরায়ু (ovary) মধ্যে এক সময়ে একটী মাত্র ডিম্বকোষ (ovum) থাকে। এই শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ প্রত্যেকেই এক একটী ক্ষুদ্র জীবকোষ মাত্র; ইহাদিগকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীর ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অনেকগুলি শুক্রকীট যখন শুক্রের সহিত জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহারা সকলেই জরায়ুস্থ ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টায় এক টুকরা মিছরির দানার গায়ে যেমন অসংখ্য পিঁপ্ড়া লাগিয়া থাকে সেইরূপ লাগিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান ও বলবান সেই কৃতকার্য্য হয়; অবশিষ্ট সকলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া পরে মরিয়া যায়। এই সম্মিলিত জীবকোষ হইতেছে প্রত্যেক মানবদেহের আদি অবস্থা। শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের দেহে প্রোটোপ্লাজম্ (protoplasm) নামক যে লালাবৎ পদার্থ থাকে এবং যাহা অবলম্বন করিয়া যে প্রাণশক্তি থাকে তাহাদের পরস্পর মিলনে অপর একটী প্রাণশক্তি বিশিষ্ট নূতন জীবকোষের সৃষ্টি হয়। এই নূতন জীবকোষ কিয়ৎপরিমাণে মাতৃ-জীবকোষের ও কিয়ৎ-পরিমাণে পিতৃ-জীবকোষের দৈহিক ও মানসিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই নূতন জীবকোষ হইতে যে দেহ গঠিত হয়, তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধি মাতার খাদ্য ও কার্য্যাবলীর দ্বারা সাধিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পরে যখন তাহা গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া বহির্জগতের সংস্রবে আসে, তাহার শারীরিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও মানসিক বৃত্তি সকলের বিকাশ, তাহার বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার (heredity), পারিপার্শ্বিক অবস্থা (envoirenment) এবং জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) ও স্বভাব অনুরূপ

নির্ব্বাচন এই কয়েকটী মানবগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহার প্রধান কারণ।

বৈজ্ঞানিকগণ মন ও মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে এইরূপ বলেন :—

"নির্জীব পদার্থের গঠন ও উৎপত্তি, তাহাদের উপাদান জড়পরমাণু সকলের অন্তর্নিহিত শক্তি সকলের ঘাত ও প্রতিঘাত ও তজ্জনিত উহাদের মধ্যে সর্ব্বদা যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় তাহা হইতে হইয়া থাকে। সজীব পদার্থের দেহের গঠন ও প্রাণের ক্রিয়া সকল নির্জীব পদার্থের গঠন ও উৎপত্তির ন্যায় একই প্রণালীতে সংঘটিত হয়। উদ্ভিদ ও জীবগণের বৃদ্ধি ও পুষ্টি, এমন কি তাহাদের স্পন্দন, অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া সকল তাহাদের দেহস্থ পরমাণু সকলের অন্তর্নিহিত নিষ্ক্রিয় (potential) শক্তির কার্য্যকরী (kinetic) শক্তিতে প্রকাশ ও তদ্বিরীত যথা—কার্য্যকরী শক্তির নিষ্ক্রিয় শক্তিতে পরিণতি, এই উভয় কারণে হইয়া থাকে। এই শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য ও পূর্ণ বিকাশ হইতেছে মানবের মন। চিন্তা ও বিচার-শক্তি মনেরই ক্রিয়া বিশেষ। মনের এই ক্রিয়া বিশেষ জীব-দেহের গ্যাংলিয়ন জীবকোষস্থ (ganglion cell) নিওরোপ্লাজম্ (neuroplasm) নামক পদার্থের পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ প্রকার পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে উহা সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনার অনধিগম্য। স্নায়ুমণ্ডলীর এই জটিল ও শ্রমসাধ্য ক্রিয়া যাহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর জীবগণের ও মানবের মনের ক্রিয়া বলি তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের শাসনেই ঘটিয়া থাকে।

"All vital activities of organic life are based on a constant reciprocity of force and a co-relative change of metabolism just as much as simplest process in lifeless bodies. Not only growth and nutrition of plants and

animals, but even the functions of sensation and movement, their sense action and psychic life depend on the conversion of potential into kinetic energy, and vice versa. Even the most perfect and elaborate forms of energy that we know—the psychic life of higher animals, the thought and reason of man—depend on material process or changes in the neuroplasm of the ganglion cell; they are inconceivable apart from such modifications. The supreme law dominates all these elaborate performances of the nervous system which we call, in the higher animals and man "the action of the mind."

—Earnest Haeckel.

হেকেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের মতে মানবের জীবাত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই। যাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি তাহা একটী পৃথক অবাস্তব পদার্থ নহে। উহা অণু, পরমাণুর ন্যায় বাস্তব পদার্থ। নরদেহে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর যাবতীয় বিভিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টিকে আমরা জীবাত্মা বলিয়া থাকি। শারীর-যন্ত্রের নানাবিধ ক্রিয়া যেমন জড়শক্তির ও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, জীবাত্মারও উৎপত্তি ঐ সকল কারণে হইয়া থাকে। দেহ ব্যতীরেকে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব মানুষের কল্পনাপ্রসূত। মৃত্যুর পরও সূক্ষ্ম শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার আশা, প্রিয়তম আত্মীয়স্বজন যাহাদের ত্যাগ করিয়া গেল তাহাদের সহিত পুনর্মিলনের আশা, মানুষ ত্যাগ করিতে পারে না। এজন্য মৃত্যুর পর তাহার জীবাত্মা তাহার দেহ হইতে অশরীরী এবং সূক্ষ্ম অবস্থায় শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিবে, মৃত

আত্মীয়-স্বজনগণের আত্মার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে এবং ইহকালে ভাল-মন্দ কৃতকার্য্যের জন্য পরকালে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে এরূপ একটা ধারণা মানুষের মনে আপনা হইতেই হয়। জড়বিজ্ঞানের মতে এরূপ জীবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়গণস্থ স্নায়ুমণ্ডলী কর্ত্তৃক মস্তিষ্কস্থ জীবকোষ সকলের যে স্পন্দন হয় তাহা হইতেই মানবের গতি, অনুভূতি, আত্মজ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া সকল প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয়গণ এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার জৈবিক ক্রিয়ার সমষ্টিকে মানবের জীবাত্মা বলা যায়। "It is the sum total of the physiological functions of the material organs or it may be called the collective title for the sum total of man's cerebral functions." মানবদেহে তাহার মস্তিষ্কের ক্রিয়া যে পরিমাণে ক্রমশঃ বিকশিত হয়, মানবের জীবাত্মাও সেই পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাল্যকালে তাহার অল্প বিকাশ হয়, যৌবনে অপেক্ষাকৃত অধিক, ও প্রৌঢ় অবস্থায় পূর্ণ বিকাশ হয়, ও বৃদ্ধাবস্থায় তাহার অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়া মৃত্যুকালে যখন তাহার শারীরিক ক্রিয়া সকলের নাশ হয় তখন তাহার জীবাত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানব যখন জরায়ু মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটী জীবকোষরূপে অবস্থিতি করে, তখন তাহার প্রাণ থাকিলেও, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন না হওয়ায় তাহার জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্ভবে না। মানুষের দেহ-গঠনের সহিত যখন জীবাত্মার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় তখন দেহের নাশ হইলে দেহ হইতে পৃথকরূপে তাহার অস্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভবে এবং তাহার পুনর্জন্মই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? মানুষের মৃত্যু হইলে তাহার দেহের উপাদান জীবকোষ সকল প্রাণহীন হয় ও তাহারা তাহাদের মৌলিক উপাদান অর্থাৎ

অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান ও অঙ্গারক প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়; এবং যে শক্তি সকল তাহার দেহে জৈবিক ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ও যাহার সমষ্টিকে জীবাত্মা বলিয়াছি, তাহারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যপ্রকার শক্তিতে পরিণত হয়। *

মস্তিষ্ক হইতে মানবের ও উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবগণের জ্ঞানের ও মনের ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের এই সিদ্ধান্ত প্রাণিগণের পীড়ার নিদান অনুসন্ধান করিলে নির্ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোন পীড়া বশতঃ যদি মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশ নষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার ক্রিয়া বিচলিত হয়। ইহা হইতে আমরা মস্তিষ্কের কোন্ স্থানের ক্রিয়া বিচলিত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারি। মস্তিষ্কের কোন অংশ পীড়াগ্রস্ত হইলে সেই স্থানের উপর যতটুকু অনুভব ও চিন্তা-শক্তি নির্ভর করে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মস্তিষ্কের যে স্থানে বাক্ শক্তির স্ফূরণ হয় তাহাতে কোন পীড়া হইলে কথা কহিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। অনেক প্রকার খাদ্য যথা, চা, কফি প্রভৃতি চিন্তাশক্তির উত্তেজক; মদ্য সুখ ও দুঃখের অনুভব শক্তিকে বর্দ্ধিত করে; মৃগনাভি কর্পূর প্রভৃতি ম্রিয়মাণ জ্ঞানকে পুনর্জীবিত করে; ইথার ও ক্লোরোফর্ম্ম জ্ঞানশক্তিকে বিলুপ্ত করে। অনুভব শক্তি ও অহংজ্ঞান যদি শরীর-যন্ত্রের বহির্ভূত কোন অভৌতিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া কি প্রকারে সাধিত হইত?

---

* জীবাত্মার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক হইলে লেখক বিবেচনা করেন জীবাত্মার পুনর্জন্ম পিতা মাতার সন্তানেই আংশিক ভাবে হইয়া থাকে। দেহের নাশ হইলে জীবাত্মার ব্যক্তিগত কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। যে বিভিন্ন শক্তি সকল মনুষ্যদেহে ব্যক্তিগত জীবাত্মারূপে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল দেহ-নাশের পর তাহারা অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

জীবাত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে যখন তাহার দৈহিক যন্ত্র সকলের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না তখন তাহার মনের ক্রিয়া কোথা হইতে আসে? তখন জীবাত্মা স্বর্গে কি নরকে গিয়া কি প্রকারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, অপ্সরীগণের নৃত্য দর্শন ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করে? মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও অন্যান্য দৈহিক ব্যাপার যখন সুখ ও দুঃখের কারণ, তখন জীবাত্মার মস্তিষ্ক এবং দেহ না থাকায় উহা কি প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে?

জগতে একমাত্র আত্মা (Energy) অতি সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্র (Substance) অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে বিদ্যমান আছে। আকাশে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আত্মা ও তাহার অবলম্বন পদার্থ বিদ্যমান নাই। এই আত্মা (Energy) কতিপয় নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত কাল হইতে পদার্থের (Matter) উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। এই ক্রিয়ায় ফলে বিশ্বের নিহারিকাময় আদি অবস্থা হইতে বর্ত্তমান রবি, শশী, নক্ষত্রপুঞ্জ-সমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের, বৃক্ষ, লতা, পুষ্পপত্র শোভিত ও নদ-নদী সাগর পর্ব্বত বেষ্টিত, মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ সমাকুল এই পৃথিবীর ও ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য সকলের উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে।

জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যে শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাই তাহার আত্মা। এই শক্তি যখন জীবগণের দেহ মধ্যে অবস্থা বিশেষে প্রাণ, মন ও গতিরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আমরা জীবাত্মা বলি। জগতস্থ সমুদয় শক্তির সমষ্টির নাম পরমাত্মা। এই পরমাত্মা পদার্থ রূপ আধার অবলম্বন করিয়া জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা অনাদি কাল হইতে এইরূপ ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। এই শক্তি কি প্রকার তাহা কেহ বলিতে

পারে না। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ও গণিত-শাস্ত্রে পণ্ডিত সার জেমস জিনস্ বলেন,—

"এই জগৎ এক বিরাট মনের চিন্তা-প্রসূত। এই মনই এই জগতের নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু এই মন আমাদের ব্যক্তিগত মন নহে। যে পরমাণু হইতে আমাদের ব্যক্তিগত মনের উৎপত্তি সেই পরমাণু সকল সেই বিরাট মনের মধ্যে চিন্তারূপে অবস্থিত ছিল এবং তাহা হইতেই জড়-পরমাণু সকলের উৎপত্তি এবং উহাতেই সেই মনের বিকাশ। জগৎ-ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় ইহার সঙ্কল্প ও পরিচালনা কোন এক বিরাট মন কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই মন কতকটা আমাদের ব্যক্তিগত মনের ন্যায় হইলেও তাহা আমাদের মনের মত ভাবপ্রবণ, নৈতিকজ্ঞান-বিশিষ্ট অথবা সৌন্দর্য্যরসগ্রাহী নহে। ঐ মন গণিতশাস্ত্রবিদের মনের ন্যায় সদা নির্ভুল চিন্তা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।" *

"Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter; we are beginning to suspect that we ought rather to point it as the creator and governor of the realm of matter—not of course our individual minds, but the mind in which the atoms out of which our individual minds have grown exist as thoughts. The old dualism of mind and matter, which was responsible for the supposed hostility, seems likely to disappear, not through matter becoming in any way

* লেখক বিবেচনা করেন জীমসের কল্পিত এই বিরাট মন ও হিন্দুদিগের উপনিষদে বর্ণিত অনন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা স্বরূপ পরমাত্মা একই পদার্থ।

more shadowy or unsubstantial than heretofore, or through mind becoming resolved into a function of the working of matter, but through substantial matter resolving itself into a creation and manifestation of mind.

We discover that the universe shows evidence of a designing and controlling power that has something in common with our individual minds,—not so far as we have discovered, emotion, morality or aesthetic appreciation, but tendency to think in the way which for want of better word, we describe as mathematical mind."

—Sir James Jeans.

হেকেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র জড়শক্তি (energy or force) ও তাহার আধার (matter or substance) কে এই জড় ও জীব-জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তাপ, আলোক, তাড়িত-শক্তি, চৌম্বক শক্তি, জীবগণের প্রাণ, মন জড়শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ বলেন তাপ, আলোক, তাড়িত শক্তি প্রভৃতি একমাত্র জড়শক্তিরই বিভিন্ন প্রকার বিকাশ হইলেও তাহা ছাড়া অপর একটী পৃথক শক্তি ইথার সমুদ্রে অবস্থিতি করে যাহাকে প্রাণশক্তি বলা যায়। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, জড়শক্তি ও প্রাণশক্তি অনন্ত ইথার সমুদ্রে অনাদিকাল হইতে অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান ছিল। প্রথমে জড়শক্তি ক্রিয়াশীল হওয়ায় জড়জগতের উৎপত্তি হইয়াছিল পরে এই পৃথিবী যখন তাহার উত্তপ্ত বাষ্পময় আদি অবস্থা হইতে ক্রম বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া

জীবোৎপত্তির উপযুক্ত হইয়াছিল তখনই তাহাতে প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। এক সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কতকগুলি জড় পরমাণুর এমন এক বিশিষ্ট সমাবেশ হইয়াছিল যে তাহার ফলে তন্নিহিত নিষ্ক্রিয় প্রাণশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া প্রটোপ্লাজম উৎপন্ন করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই এই উদ্ভিদ ও জীবজগৎ ক্রম বিকশিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। গতিশক্তি, মন, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, অহংজ্ঞান প্রভৃতি এই প্রাণশক্তিরই ক্রম বিকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিই ঈশ্বর।

পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা হইতে বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত উপনিষৎ সকল পাঠে জানা যায় যে তাঁহারা কোন এক শক্তি বিশেষকে—যাহাকে তাঁহারা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নামে উল্লেখ করিয়াছেন—এই বিশ্বজগতের এক মাত্র আদি কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন এই শক্তির স্বরূপ কি প্রকার তাহা তাঁহারা জানেন না। আর্য্য ঋষিগণ বলেন যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা এই শক্তি বা পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করিতে পারা যায়। তাঁহারা বলেন এই পরমাত্মা "সচ্চিদানন্দম্" এবং "জ্ঞানমনন্তম্"; তিনি আছেন বলিয়া "সৎ", চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া "চিৎ", স্বয়ং পরিপূর্ণ বলিয়া "আনন্দম্"। এই পরমাত্মা পঞ্চভূত বা জড় প্রকৃতির সাহায্যে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন এবং কালে এই পঞ্চভূতেই বিলীন হইবেন। এইরূপ অনাদিকাল হইতে হইয়া আসিতেছে।

"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্য কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়-

মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্ন প্রজ্ঞাঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সঞ্‌জ্ঞাস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।"

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

সৈন্ধব লবণ যেমন অন্তরবাহ্য ভেদশূন্য একরূপ লবণ রস, আত্মাও সেইরূপ অন্তরবাহ্য ভেদশূন্য একরূপ প্রজ্ঞা স্বরূপ। সেই আত্মা পঞ্চভূতের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া সেই পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া যায়। বিলীন হইলে আর সংজ্ঞা থাকে না।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপংরূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

—কঠোপনিষৎ।

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরেও আশ্রয়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

যিনি ইহাদিগের মধ্যে অতিসূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাহার সত্ত্বাতেই এ বিশ্ব জগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি।

মানবের ইতিহাস

মানবের ইতিহাস

৪

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধর্ম্মপুস্তক মনুসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা—"সেই প্রভু আপনার দেহকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন, এবং নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বয়ং যাহাকে সৃষ্টি করিলেন আমি সেই মনু; আমাকে এই সমুদায়ের দ্বিতীয় স্রষ্টা বলিয়া জানিও। আমিই প্রজা-সৃষ্টির মানসে সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মহর্ষি প্রজাপতি সৃষ্টি করিলাম। এই দশ প্রজাপতি আবার সপ্ত মনু, দেবতা, অসুর, নাগ, সর্প, গরুড়াদি পক্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন।"

মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে এইরূপ লিখিত আছে; যথা—"ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পৃথিবী তখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ঈশ্বরের আজ্ঞামাত্র আলোকের উৎপত্তি হইল। তখন তিনি আলোক হইতে অন্ধকারকে পৃথক করিয়া দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর জল হইতে স্থলকে পৃথক করিলেন এবং স্থলের উপরে বৃক্ষাদি উদ্ভিদ সকল সৃষ্টি করিলেন। তার পর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর মৎস্য ও পক্ষী সকল ও পরে পশু সকল সৃষ্টি করিলেন এবং সকলকে জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিলেন। পাঁচ

দিবস কাল এইরূপে সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া ষষ্ঠ দিবসে আদম নামে এক নর সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে একটী সঙ্গিনী দিবার অভিপ্রায়ে সে নিদ্রিত হইলে তাহার পঞ্জর হইতে একটু অস্থি লইয়া তাহা হইতে ইভা নামে এক নারী সৃষ্টি করিলেন। সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন। পৃথিবীর সমুদায় মানব এই আদম ও ইভার বংশধর।

বৈজ্ঞানিকগণ বহু কাল হইতে গবেষণা করিয়া মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কেমন করিয়া প্রথমে বিদ্যুৎকণা হইতে পরমাণু বা এটম, এটম হইতে অণু বা মোলেকিউল, অণু হইতে প্রোটোপ্লাজম এবং তাহা হইতে জীবাণু (cell) সকল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা লিখিত হইয়াছে। এই জীবাণু সকল কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া ক্রম-বিকশিত হইয়া প্রথমে শম্বুকাদিরূপে পরে ক্রমান্বয়ে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশুরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে সৃষ্টির কোন এক সময়ে পশুদিগের মধ্যে বানর জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই বানর জাতিই মানবের পূর্ব্বপুরুষ।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কেণ্ট নামক প্রদেশের অন্তর্গত ডাউন নামক কোন পল্লীগ্রামে চারলস্ ডারউইন নামক এক ব্যক্তি ২২ বৎসর কাল নানাপ্রকার গবেষণা করিয়া Origin of Species নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবার পথের সূচনা করেন। ইহার ১৫ বৎসর পরে Variation of Animals and Plants under Domestication নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হন। খৃঃ ১৮৭১ সালে তিনি Descent of Man নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থানে উপনীত হন। সেখানে তাঁহার অনেক শত্রু দেখা দিল। উক্ত পুস্তকে বানর হইতে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে এই কথা লিখিত থাকায় তৎসাময়িক বিদ্বন্মণ্ডলী বিশেষতঃ

ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ডারউইনের ক্রম-বিকাশ মত মানিয়া লইয়া নিম্নশ্রেণীর জীব সকলের ক্রমোন্নতি হইয়া কালে উচ্চ শ্রেণীর জীবে পরিণতি হইয়াছে এ কথা স্বীকার করিলেও, বানর হইতে ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা স্বীকার করেন নাই। পাদ্রি সম্প্রদায় এখনও উহা স্বীকার করেন না; কারণ, তাঁহাদের বাইবেল ঐ কথা বলে না। মনীষী ডারউইন্ এখন জীবিত নাই; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সমগ্র বিদ্বন্মণ্ডলী আজ তাঁহার মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছেন।

ডারউইন কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা সার আর্থার কীথের ভাষায় নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

"এক্ষণে দেখা যাউক ডারউইনের Descent of Man বহিখানি কি প্রকার। ইহা একখানি ইতিহাস—নূতন ধরণে লেখা। এ প্রথায় ইতিহাস রচনা করা ডারউইনেরই বিশেষত্ব। যদি কেহ বর্ত্তমান কালের বাইসিকেল অর্থাৎ দ্বিচক্রযানের ইতিহাস লিখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে ইতিহাস লিখিবার মামুলী প্রথা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে প্রকাণ্ড একটা চাকার পিছনে একটী ছোট চাকা জোড়া যাহা একপ্রকার হাত পা ভাঙ্গিবার কল বলিলেও চলে এই প্রকার যে দ্বিচক্রযান প্রচলিত ছিল, তাহা কোন্ সময়ে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান কালের দ্বিচক্র যানে—যাহা আজকাল অলিগলির ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়—পরিণত হইয়াছে তাহার তারিখযুক্ত প্রামাণ্য লিপি সকল অনুসন্ধান করিতে হয়। মনে করুন এরূপ কোন তারিখযুক্ত প্রামাণ্য লিপি পাওয়া গেল না, কিন্তু দেখা গেল, একটী গুদামে কতকগুলা নানা রকমের পুরাণ দ্বিচক্রযান গাদা করা রহিয়াছে। এ স্থলে তাঁহাকে ডারউইনের ইতিহাস লিখিবার প্রথা অবলম্বন করিতে

হইবে। এক একখানি গাড়ীর যন্ত্রের সহিত অপর একখানি গাড়ীর যন্ত্রের ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাযুক্ত তুলনা করিলে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কাহার পর কোন্‌টী হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে ঐ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ও কত দিন তাহা প্রচলিত ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। ডারউইন এইরূপ আনুষঙ্গিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মানবের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি মানবের সহিত কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে এরূপ জন্তু সকলের দেহের গঠন, তাহাদের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎকালে ভ্রূণতত্ত্ব যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার সাহায্যে গর্ভমধ্যে মানবের ভ্রূণের পরপর অবস্থার সহিত অন্যান্য জন্তুর ভ্রূণের অবস্থার সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঔষধাদি প্রয়োগ, পীড়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকল মানবের দৈহিক যন্ত্রের উপাদান সকলের উপর কি প্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মানবগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি কেন হইল তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রাকৃত ঘটনাকে ন্যায়শাস্ত্রানুগত যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ডারউইন মানবের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।”

ডারউইনের মৃত্যুর পর অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক-তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য অবলম্বন করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ ডারউইনের মতের পোষকতা করেন তন্মধ্যে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও জন্তুর ধ্বংসাবশেষ (fossil remains) সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও জন্তুর ধ্বংসাবশেষ জিনিষটা কি তাহা সংক্ষেপে একটু বুঝান আবশ্যক। পৃথিবীর উত্তপ্ত বাষ্পীয় অবস্থার পর উহার উপরিভাগ শীতল হইতে আরম্ভ হইলে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ক্রিয়াবশতঃ উহার উপর অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। কখনও বা উহার উপরিভাগের

কোন কোন অংশ জলমগ্ন হইয়া গভীর সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল; কখনও বা কোন অংশ ঠেলিয়া উঠিয়া পর্ব্বত, হ্রদ, নদী প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়াছিল, কখনও বা ভয়ঙ্কর তুষারপাত হইয়া কোন কোন স্থান বরফে মণ্ডিত হইয়াছিল। তৎকালে পর্ব্বত হইতে যে সকল নদ, নদী উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল। এই সকল নদ নদী উক্তরূপে প্রবাহিত হওয়া কালীন তাহার স্রোতের সহিত মৃত জীব জন্তু সকলের অস্থিপঞ্জর, মাটি, বালি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও গলিত পত্রাদি সঙ্গে লইয়া আসে এবং পরে ঐ সকল নদ নদী যখন সমুদ্রে পতিত হয়, তখন তাহাদের জল থিতাইয়া, তীরের নিকটস্থ সমুদ্র-জলে একটী স্তর উৎপাদন করে। কখনও বা উহা সমুদ্রের স্রোতের দ্বারা সমুদ্রের দূরস্থ তলদেশে নীত হইয়া তথায় উক্তরূপ স্তর উৎপাদন করে। নদীর স্রোতে আনীত মৃত জন্তুর অস্থি-পঞ্জরাদি ঐ স্তরের ভিতর থাকিয়া যায়। ইহা ব্যতীত সমুদ্রের দূরবর্ত্তী তলদেশে সামুদ্রিক জীবজন্তুগণের অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বদা পতিত হওয়ায় তথায় মৃত জন্তুর অস্থি কঙ্কালের একটী স্তর পড়িয়া থাকে। এই এক একটী স্তর চারি পাঁচ হাজার ফিট হইতে দশ বার হাজার ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। এই সকল স্তরকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় (Stratified rocks) শৈলস্তর এবং এই স্তরের ভিতর যে সকল মৃত জীব-জন্তুর কঙ্কাল দৃষ্ট হয় তাহাকে (Fossil remains) প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক বিপ্লববশতঃ যখন সমুদ্রগর্ভের কোন অংশ পর্ব্বত-রূপে পৃথিবীর উপরিভাগে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, তখন পর্ব্বতগাত্রে ও পার্ব্বতীয় নদী সকলের তলদেশে ঐ সকল স্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে স্থানে স্থানে শম্বুকাদি মৃত জন্তুর খোলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জীবজন্তু সমুদ্রগর্ভেই বাস করে,

তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের উপরিভাগে কখন সম্ভবে না। ইহা হইতে জানা যায় যে এক সময়ে হিমালয় পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল ও কঠিন হইলে উহার প্রথমাবস্থায় পৃথিবীতে কোন বৃক্ষলতা বা জীবজন্তু ছিল না। ইহার কোন এক স্তরে অনুকূল অবস্থায় কতকগুলি নির্জীব জড় পরমাণুর জলমধ্যে বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছিল। সূর্য্যের উত্তাপে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঐ পরমাণু সকল প্রোটোপ্লাজমরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রোটোপ্লাজমেই প্রথম প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; ইহা হইতেই উদ্ভিদ ও জীবগণের দেহের উপাদান জীবকোষ বা সেল সকলের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি প্রথম প্রবন্ধে এই জীবকোষ (cell) সকল হইতে কি প্রকারে উদ্ভিদ ও জীব দেহ গঠিত হয় তাহা বলিয়াছি। প্রত্যেক মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব পিতৃমাতৃ জীবকোষের মিশ্রণে আদিতে একটী ক্ষুদ্র উর্ব্বরতা প্রাপ্ত (fertilized) জীবকোষরূপে মাতৃগর্ভে থাকিয়া প্রথমে দ্বিখণ্ডিত হয় পরে একটী আবরণীর মধ্যে থাকিয়া বারংবার খণ্ডিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র আঁটির আকার ধারণ করে, তখন তাহার সেই অবস্থাকে মরুলা (morula) বলে পরে যখন তাহা মুখগহ্বর বিশিষ্ট হইয়া ঘোড়ার ক্ষুরের নালের ন্যায় আকার ধারণ করে তখন তাহার সেই অবস্থাকে গ্যাসট্রুলা (gastrula) বলে (১নং চিত্র)। এই গ্যাসট্রুলার পরবর্ত্তী অবস্থাকে ভ্রূণ বা embiyo বলা হয়। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় উহা মৎস্যের, কুকুরের, গরুর কি মানুষের ভ্রূণ তাহা চেনা যায় না, কারণ সে অবস্থায় তাহারা সকলেই দেখিতে প্রায় এক প্রকার (২নং চিত্র দেখ)।

মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের শেষ অংশকে শরীর বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অস্ কক্সিস্ (os coccix) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা লাঙ্গুলের কোন

১নং চিত্র—উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত জীবকোষের খণ্ডিত অবস্থা

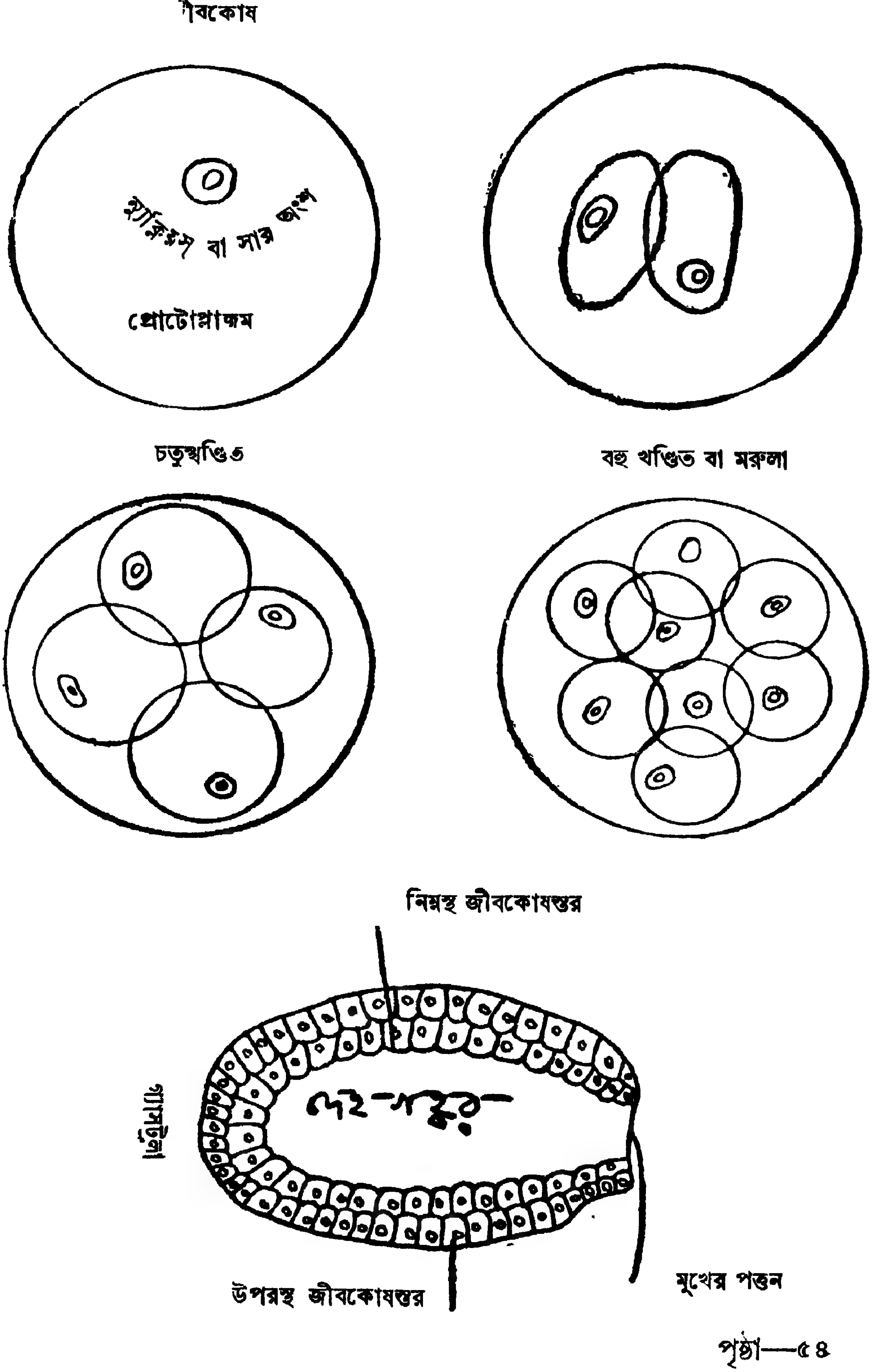

পৃষ্ঠা—৫৪

২নং চিত্র

আদিতে সকল জন্তুরই আকার প্রায় এক প্রকার

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রথম অবস্থা

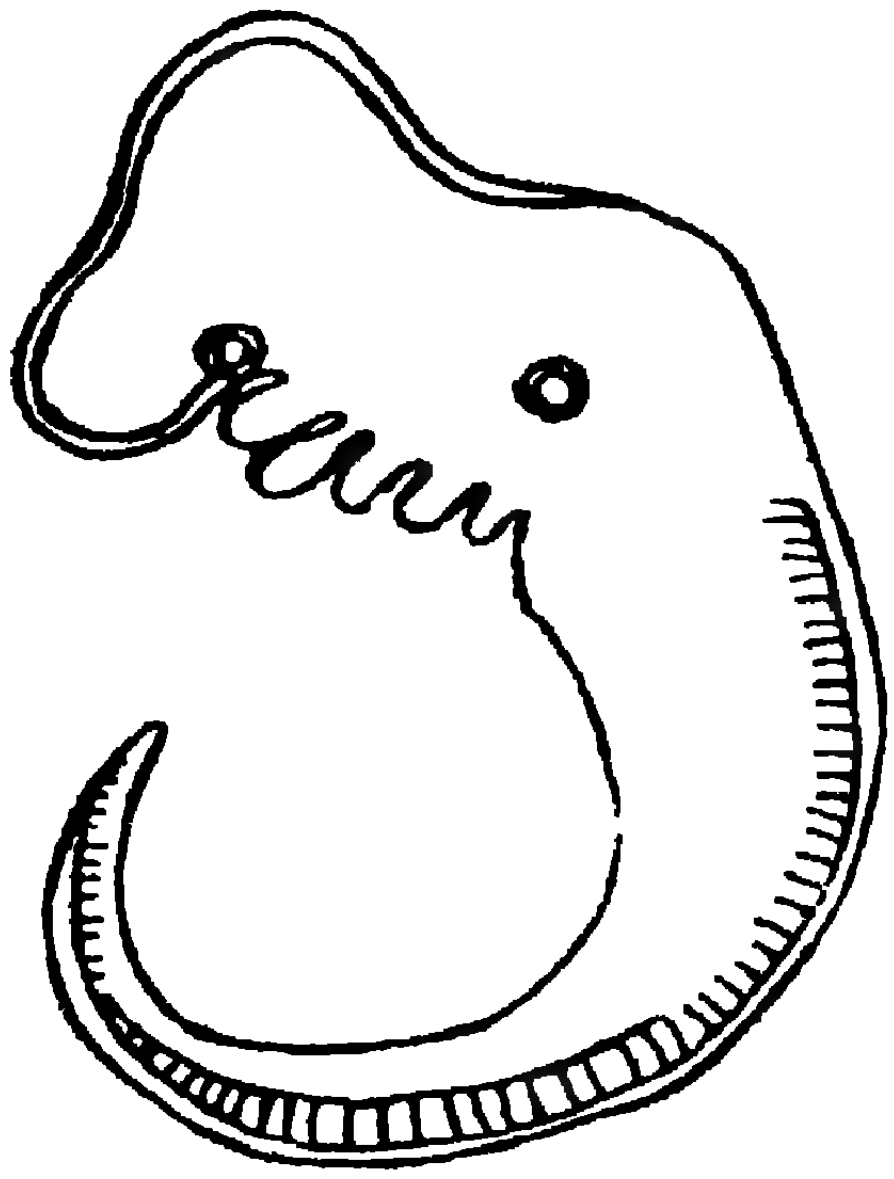

গরু

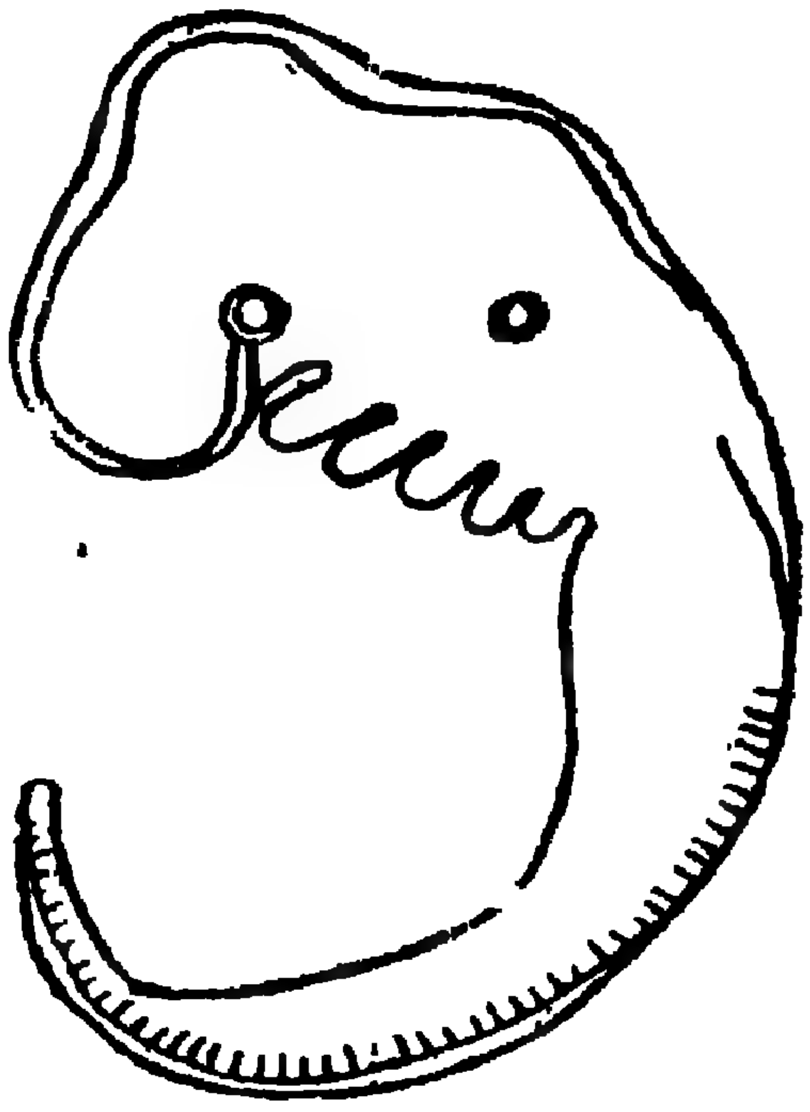

মানুষ

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের দ্বিতীয় অবস্থা

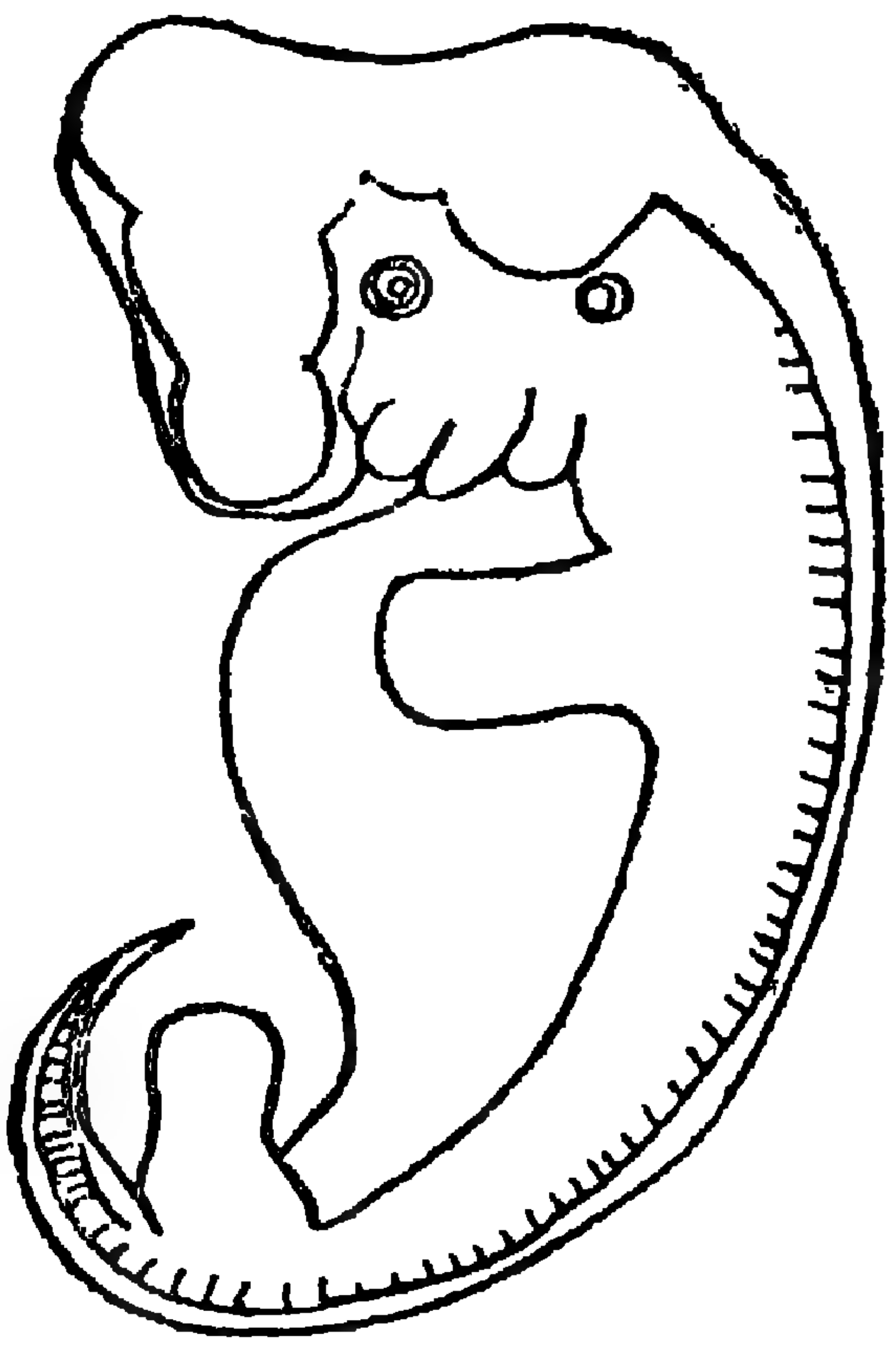

গরু

মানুষ

পৃষ্ঠা—৫৪

২নং চিত্র

আদিতে সকল জন্তুরই আকার প্রায় এক প্রকার

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের তৃতীয় অবস্থা

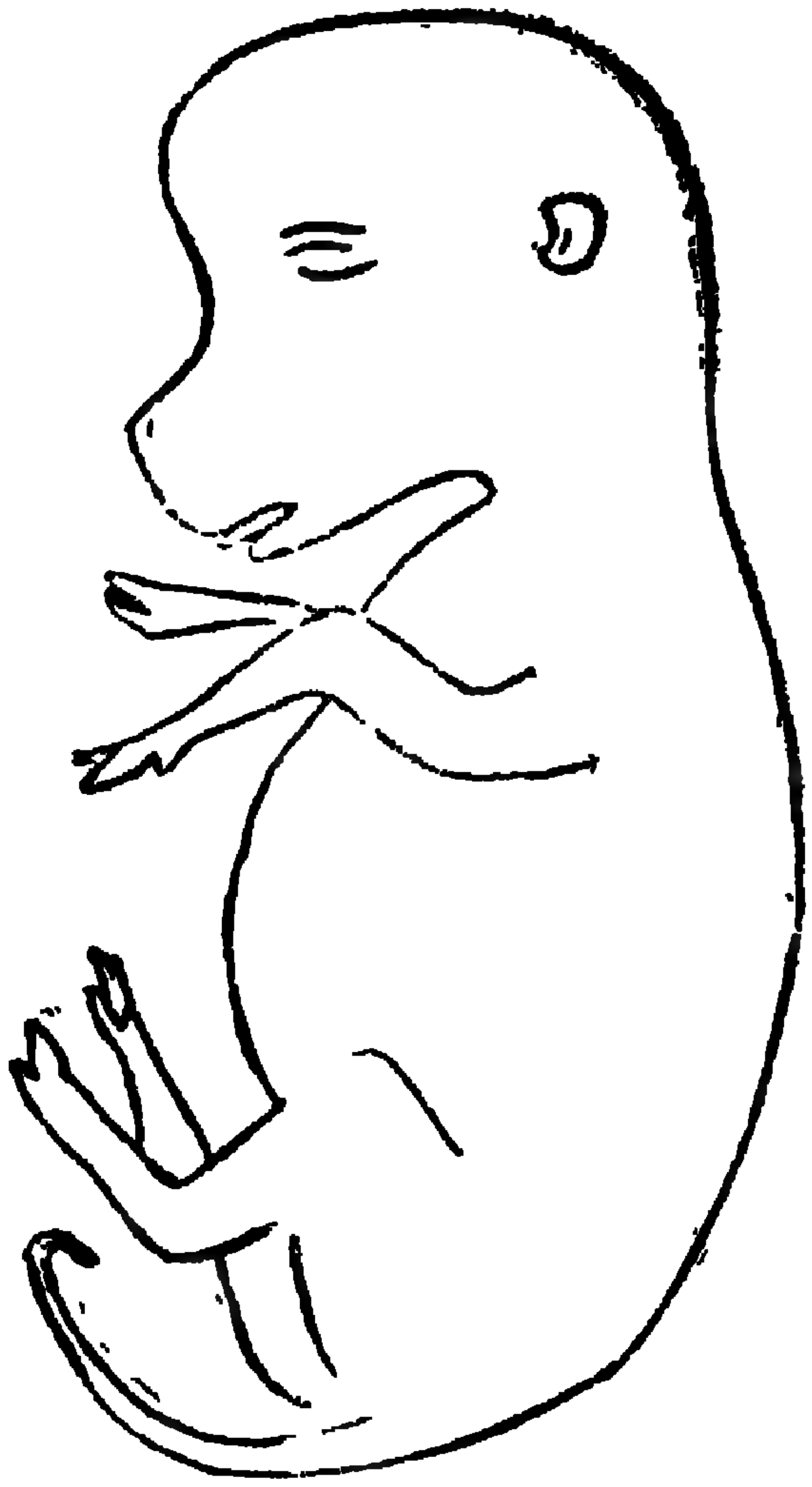

গরু

মানুষ

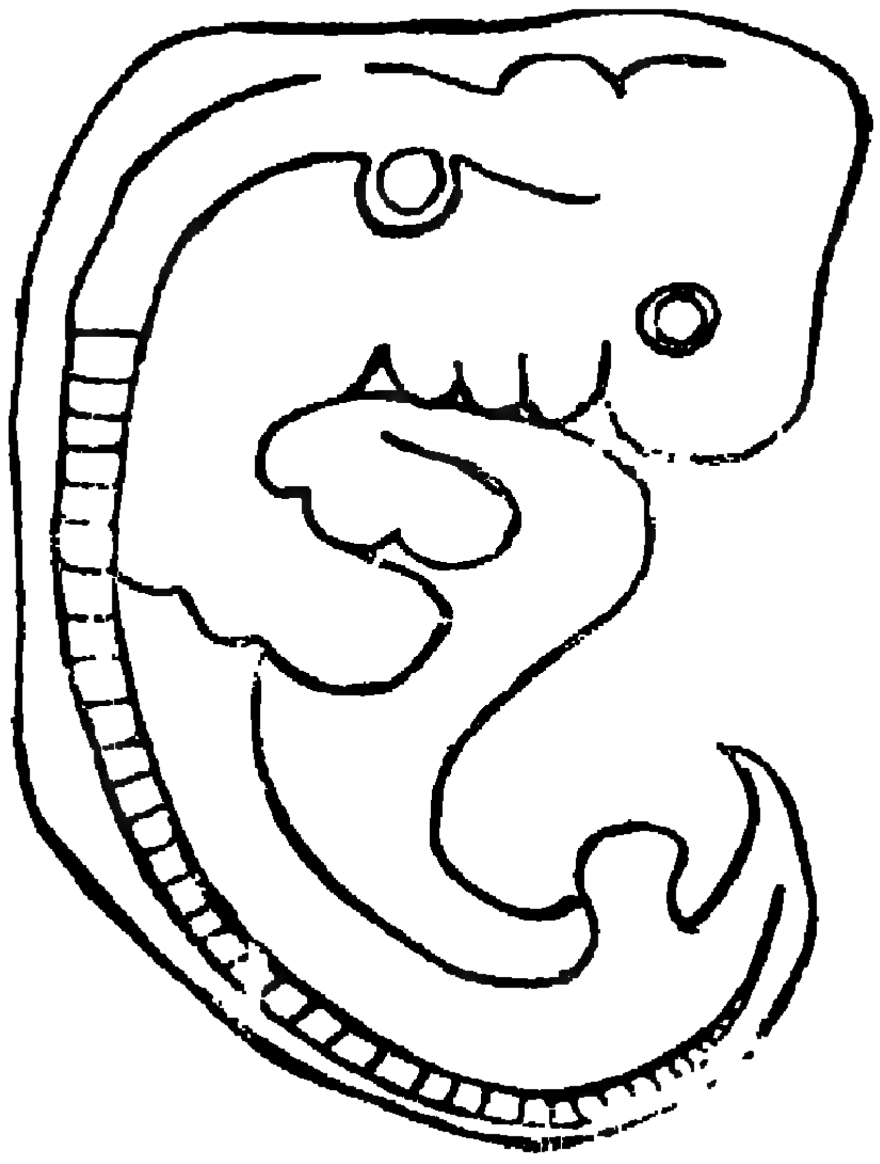

মাতৃগর্ভে
একমাসের কুকুর-ছানা

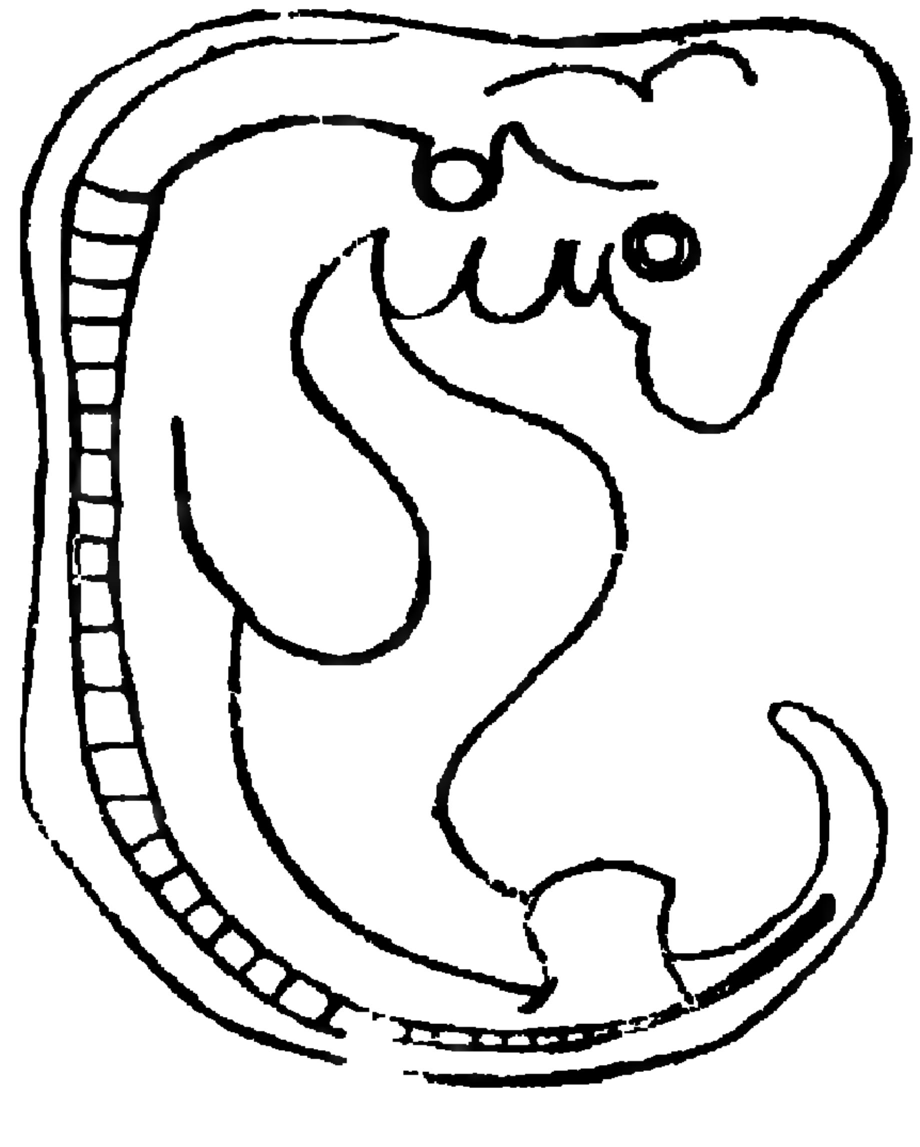

মাতৃগর্ভে
একমাসের মানব-শিশু

অংশ না হইলেও মেরুদণ্ড বিশিষ্ট জীব মাত্রেরই ইহা থাকে। ইহাকে ভাবী লাঙ্গুলের অব্যক্ত অবস্থা বা মূল বলা যাইতে পারে। মাতৃগর্ভে কুকুর, গরু, মানুষ প্রভৃতি সকল জীবের ভ্রূণের অপুষ্ট অবস্থায় এই লাঙ্গুল মূল বর্ত্তমান থাকে, পরে ভ্রূণ পরিপুষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবে উহা বর্দ্ধিত হইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং মানুষে উহা বর্দ্ধিত না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়া যায়। মানবের আদি এবং তাহার প্রাথমিক অবস্থা হইতে ক্রম বিকাশ যে ভাবে হইয়াছে তাহার এক সোপান নিম্নশ্রেণীস্থ জীবের আদি ও তাহার প্রাথমিক অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশ সেই ভাবেই হইয়াছে দেখা যায়। কুকুরের ক্রমবিকাশ হইয়া কালে যদি বানরের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা হইলে বানরের ক্রমবিকাশ হইয়া মানবের উৎপত্তি হওয়া অধিকতর সম্ভব, কারণ কুকুরের সহিত বানরের যে সৌসাদৃশ্য মানুষের সহিত বানরের তদপেক্ষা অনেক অধিক সৌসাদৃশ্য। মাতৃগর্ভে জীবের যে রূপ ক্রমবিকাশ হইয়া অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় তাহাতে বহির্জগতে ক্রমবিকাশ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বানর হইতে কোন সুদূর অতীত কালে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন যুগের শিলাস্তর পরীক্ষা করিয়া এক এক যুগের স্তরে একই প্রকার জীবের প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাইয়াছেন। অতি প্রাচীন যুগের স্তর সকলে প্রস্তরীভূত শম্বুকাদির খোলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ যুগে শম্বুকাদির ন্যায় মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক-বিহীন শম্বুক শ্রেণীর জীব সকলের আবির্ভাব হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের স্তর সকলে মেরুদণ্ড ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্কবিশিষ্ট মৎস্য জাতীয় জীব সকলের প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পর পর শৈলস্তর

সকলে যথাক্রমে মেরুদণ্ড ও উত্তরোত্তর বৃহত্তর মস্তিষ্ক বিশিষ্ট সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জন্তু ও সর্ব্বশেষ স্তরে বানরজাতীয় জীব সকলের প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর সকল দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন যুগের শম্বুকাদি জীব সকল ক্রমবিকশিত হইয়া পরপর যুগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর জীবে পরিণত হইয়াছিল (৩নং চিত্র)। ৯ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ মায়োসিন (miocine) যুগের শিলাস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে গরীলা ও সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর বানর তৎকালে ছিল না। ৪ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার অর্থাৎ প্লিওসিন (pleocine) যুগের স্তরের ভিতর পূর্ব্বকথিতরূপে নদীস্রোতে যে সকল দ্রব্যাদি ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহার সহিত এমন সকল প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাই যাহার অগ্রভাগ ছুঁচাল ও গোড়ার দিক মোটা, ইহাতে বুঝা যায় যে, কোনও প্রাণী ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড নিজ কার্য্য জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সসেক্স্ প্রদেশে কোন শুষ্ক নদীর গর্ভস্থ কঙ্কররাশির মধ্যে একপ্রকার প্রাণীর মাথার খুলি ও তৎসঙ্গে যন্ত্রাকারে নির্ম্মিত হস্তীর উরুদেশের হাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার মস্তকের খুলি ও চোয়ালের হাড় জর্ম্মণি ও চীন দেশের নদী গর্ভস্থ কঙ্কররাশির মধ্যেও দেখা গিয়াছে। এই শ্রেণীর মাথার খুলিকে বৈজ্ঞানিকগণ পিল্টডাউন (Piltdown) নামকরণ করিয়াছেন এবং ইহা কোন উন্নত শ্রেণীর বানর-জাতীয় প্রাণীর মাথার খুলি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

৩নং চিত্র

প্রোটোপ্লাজম হইতে ক্রম বিকাশ অনুযায়ী জীবোৎপত্তির ধারা

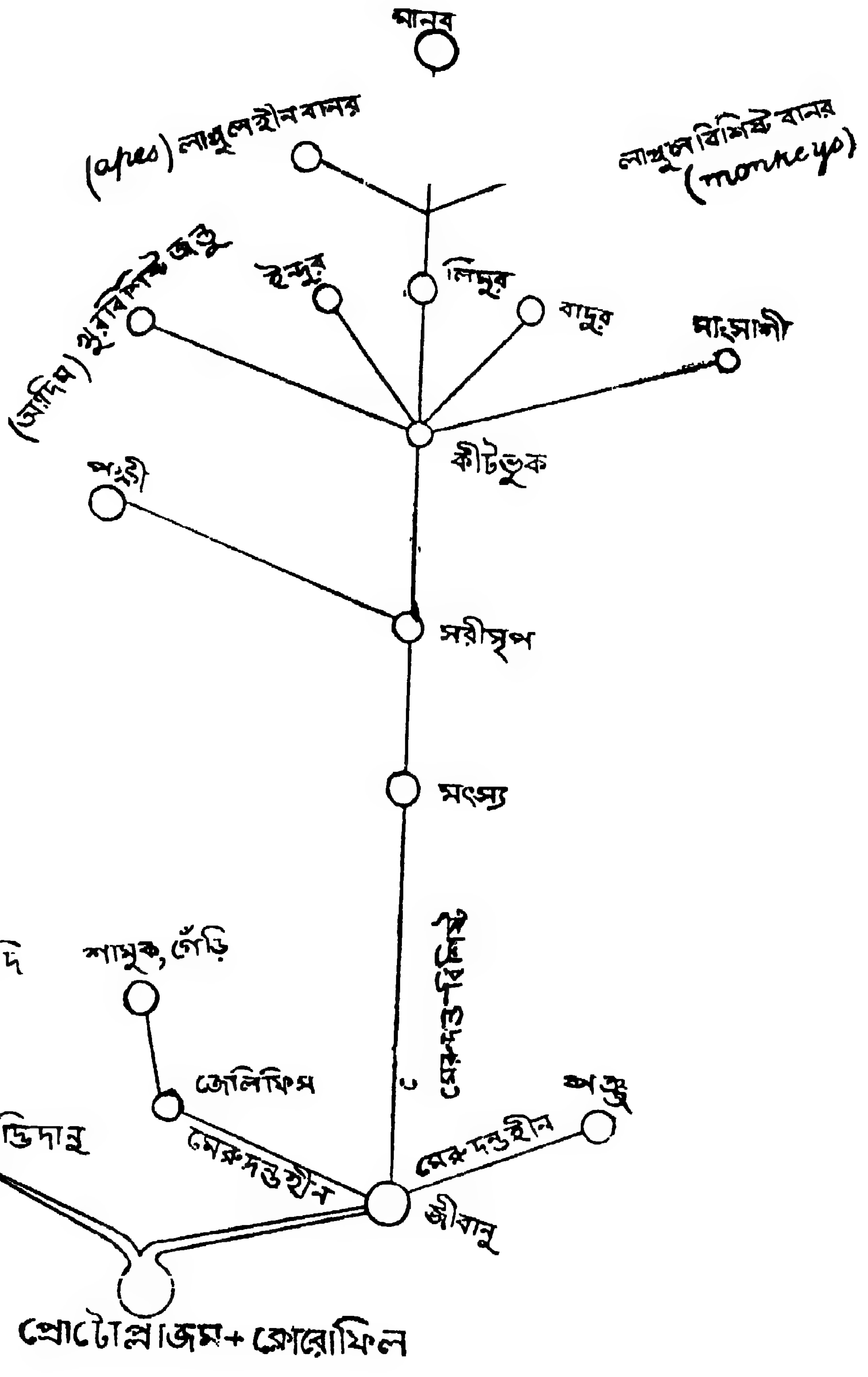

পৃথিবীর প্রাচীন স্তর সকলের চিত্র

বাম দিকে প্রাণী সকলের নাম।		দক্ষিণে স্তর সকলের নাম ঃ
নিয়াণ্ডারথাল মনুষ্য	কেনোজোয়িক	প্লাইওসটিসিন, ৪০০০ ফিট ২ লক্ষ বৎসর (আধুনিক)
রোডোসিয়ান মনুষ্য পিল্টডাউন মনুষ্য		প্লাইওসিন, ৫০০০ ফিট ২ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর
আউরাং, সম্পান্জি গরীলা		মাইওসিন, ৯০০০ ফিট ৬ লক্ষ বৎসর
উচ্চশ্রেণীর বানর হনুমান		অলিগোসিন, ১২০০০ ফিট ৬ লক্ষ বৎসর
বানর স্তন্যপায়ী প্রাণী		ইয়োসিন, ১২০০০ ফিট ৬ লক্ষ বৎসর
পক্ষী সরীসৃপ	মেসোজোয়িক	ক্রিটানিয়স্ জুরাসিক্ ট্রিনাসিক
চিঙ্গড়ি-মাছ শম্বুক, গেঁড়ি	পেলিওজোয়িক	পেরিনিয়ান কারবনিফারস্ ডিভোনিয়ান্ সেলুরিয়ান্ ক্যামব্রিয়ান্
কোন প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না।	আরকেয়িক	আদি স্তর

প্রায় ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে এমন এক প্রাণী বাস করিত যাহার ধ্বংসাবশিষ্ট কঙ্কাল দেখিয়া পণ্ডিতগণ তাহাকে মানবজাতীয় প্রাণী বলিয়া বিবেচনা করেন। সে শীতকালে শীত নিবারণ জন্য গুহা-মধ্যে বাস করিত ও গাত্র আবরণ জন্য পশুচর্ম্ম ব্যবহার করিত। তাহার গুহা মধ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি বর্ত্তমান মানবের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে কার্য্য করিত।

মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহার মাথার খুলি ও কঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া বলেন সে আসল মানব নহে; মানব যে জাতীয় প্রাণী সে তাহারই কোন এক শ্রেণী-বিশেষ। তাহার চোয়ালের অস্থি সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কপাল ছোট ও ভ্রূর নীচের হাড় বৃহৎ ছিল। মেরুদণ্ডের উপর তাহার মস্তক এমনভাবে গ্রথিত ছিল যে সে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে পারিত না। তাহার দাঁতও মানুষের দাঁতের ন্যায় ছিল না।

জর্ম্মণীর অন্তর্গত ডুসেলড্রফ্ প্রদেশের মধ্যে নিয়ান্ডারথাল নামক স্থানে কোন গহ্বরে এই জাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল প্রথম দৃষ্ট হয়। ইহারা মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত ও মৃত আত্মার নিমিত্ত খাদ্য ও যন্ত্রাদি তৎসঙ্গে রাখিয়া দিত। ইহাদের মস্তক সাধারণ মানুষের অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। ইহাদের চোয়ালের অস্থি দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমাদের ন্যায় বাক্শক্তি ইহাদের ছিল না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন সাগরের ব্যবধান ছিল না। টেমস নদীর উত্তর প্রদেশ সকল এবং রাসিয়া ও জর্ম্মণির উত্তরভাগ সমস্ত বরফে মণ্ডিত ছিল। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর তৎকালে কোন পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকা ছিল (৪নং চিত্র)। নিয়াণ্ডারথালনিবাসী পূর্ব্বোক্ত প্রাণিগণ তৎকালে বনজাত ফল মূল ও ছোট ছোট জন্তু বধ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

৪নং চিত্র

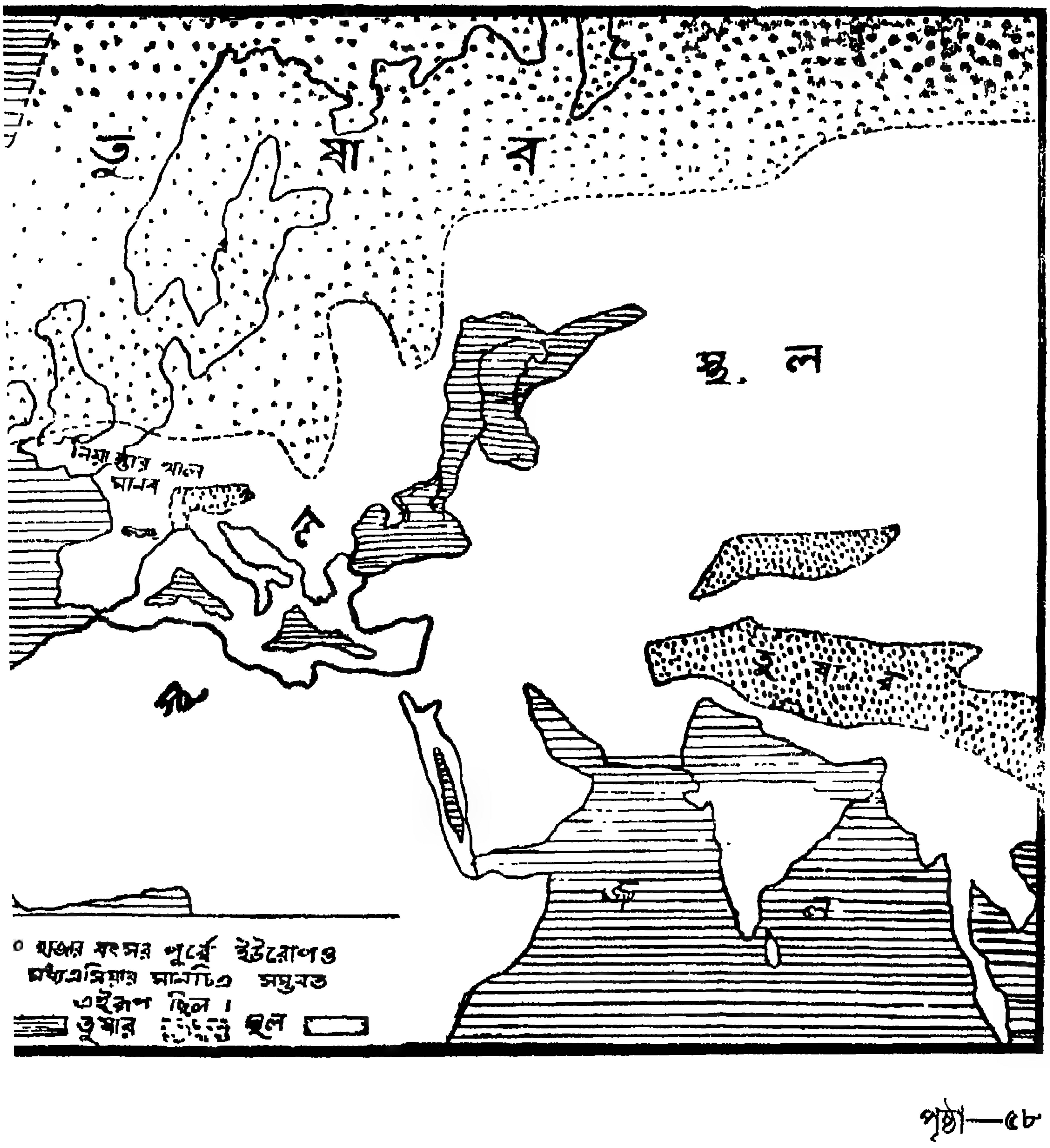
তু ষা র
স্থ. ল
নিয়াণ্ডার থাল মানব
হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপও মধ্যএসিয়ার মানচিত্র সম্ভবত এইরূপ ছিল।
তুষার
স্থল

চারি হাজার বৎসর কাল এই নিয়াণ্ডারথালনিবাসী জীবগণ ইয়োরোপে বানর অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরূপে বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান কালের ৩০।৩৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের উত্তরখণ্ডে তুষারপাত হ্রাস হইতে আরম্ভ হওয়ায় ইয়োরোপ অপেক্ষাকৃত গরম হইয়া বাসের উপযোগী হইয়াছিল। অপর এক শ্রেণীর প্রাণী, যাহারা নিয়ানডারথালবাসী প্রাণিগণের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বাক্যকথনক্ষম ছিল ও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, দক্ষিণ দিক হইতে আগত হইয়া নিয়াণ্ডারথালনিবাসী প্রাণিগণকে বধ করিয়া তাহাদের নিবাসভূমি হইতে বিদুরিত করিয়াছিল। এই নবাগত প্রাণিগণের ধ্বংসাবশিষ্ট কঙ্কাল সকল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় বানরের কঙ্কালের সহিত এই সকল কঙ্কালের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মুখ নিয়ানডারথালনিবাসিগণের মত বানরের ন্যায় ছিল। ইহারাই আসল মানব এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল।

পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বানর জাতীয় কোন একশ্রেণীর প্রাণীর ক্রমবিকাশ হইয়া মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ ধারণা না করেন যে বর্ত্তমানকালে যে সকল বানর আমরা দেখিতে পাই মানুষ ইহাদেরই কাহারও সন্তানসন্ততি। আমি তাঁহাদের ইহাই বুঝাইতে চাই যে, পৃথিবীর কোন এক অবস্থায় সুদূর কোন এক কালে যে মূল প্রাণী হইতে বর্ত্তমান বানরজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, মানবজাতিও সেই মূল প্রাণী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিদ্যুৎকণার ক্রমবিকাশ হইতে যখন এই জগতের উৎপত্তি তখন বানর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী কোন এক প্রাণীর ক্রমবিকাশ বশত বানর ও মানব উভয়েরই উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নট্যাল সাহেব ভিন্ন

ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটী সঠিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি গরীলা, সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরজাতীয় প্রাণীর ও মানবের রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া তাহাদের রক্তে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া (re-action) লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সকল পশু বানর হইতে নীচ জাতীয় তাহাদের রক্তে, বানর অপেক্ষা তাহাদের শরীরের গঠন যে পরিমাণে হীন সেই পরিমাণে অল্প প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন রোগের সংক্রামক বীজাণু সকল মানুষের শরীরে যেমন ক্রিয়া প্রকাশ করে, বানরের শরীরে সেইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষের মস্তিষ্ক ও বানরের মস্তিষ্ক এক প্রকারের হওয়ায় অস্ত্রচিকিৎসকগণ গবেষণা করিবার কালীন মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে বানরের মস্তিষ্ক ব্যবহার করিয়া থাকেন। গর্ভমধ্যে মানবের ভ্রূণ যে সকল জটিল প্রক্রিয়া দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, বানরের ভ্রূণও তাহার মাতার গর্ভে ঠিক সেইরূপ প্রক্রিয়ায় বর্দ্ধিত হয়। মানবের মাতা যে ভাবে তাহার শিশু সন্তান সকলকে আদর করে, স্তন্যপান করায়, হনুমানের ছানাকে তাহার মাতা অনেকটা সেইপ্রকার করে, এবং শিশুর মৃত্যু হইলে বানরী কয়েক দিবস যাবৎ তাহার মৃত সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়ায় এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া একান্তে বসিয়া থাকে। এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিলে মানব ও বানর যে এক বংশ হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক এলিয়ট স্মিত বলেন, বানরের মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কোন উপাদান নাই যাহা মানুষের মস্তিষ্কে নাই এবং মানুষের মস্তিষ্কে যাহা কিছু আছে সমস্তই সিম্পাঞ্জি ও গরীলার মস্তিষ্কে দৃষ্ট হয়—পার্থক্যের মধ্যে বানরে যাহা আছে মানুষের তাহা অধিক পরিমাণে আছে। মানুষের মস্তিষ্কে ঐ সকল অংশ অধিক প্রসারিত হওয়ায় তাহার অনুভব-শক্তি,

বুঝিবার, কার্য্য করিবার, শিক্ষা করিবার ও কথা কহিবার ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকে হনুমানের দল দেখিয়াছেন। ইহাদের এক একটী দলে ২০ হইতে ৫০ বা ততোঽধিক হনুমান থাকে। ইহারা বনে বাস করে এবং লোকালয়েও বাস করে। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। ইহারা ফল, মূল, গাছের কচি পাতা, শস্য প্রভৃতি খাইয়া এক বন হইতে অন্য বনে অথবা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। গৃহস্থের ঘরের শিকল খুলিয়া গৃহে রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়া দেয়। স্ত্রীলোক কিম্বা বালক তাড়া করিলে দাঁত খিঁচাইয়া ভয় দেখায়, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ তাড়া করিলে পলাইয়া যায়। যে সকল বানর সহরে বা গ্রামে বাস করে লোকালয়ের বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করার নিয়ত চেষ্টায় তাহাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং চুরি করিয়া খাইবার বুদ্ধিও তৎসঙ্গে কতকটা পক্কতা লাভ করে। লেখক কাশীতে থাকা কালীন একদিন দেখিয়াছিলেন একটা ঘরে কোন ব্যক্তি একটা ঝুড়িতে ফলমূল ও তরীতরকারি রাখিয়া দ্বারে শিকল আঁটিয়া তাহাতে তালাবন্ধ করিয়া বাহিরে গিয়াছিল। সেই ঘরের একটা জানালা খোলা ছিল, কিন্তু তাহাতে লোহার গরাদে লাগান ছিল। একটা বানর বাহির হইতে সেই ঘরে তরকারির ঝুড়ি দেখিয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া ঝুড়ি হইতে তরকারি বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝুড়ি একটু দুরে থাকায় তাহার নাগাল পাইল না। তখন তাহার ছানাটাকে গরাদের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। ছানটা ঘরে ঢুকিয়া ঝুড়ি হইতে ফলমূল আলু বেগুন প্রভৃতি লইয়া গরাদের ফাঁক দিয়া তাহার মাতাকে বাহির করিয়া দিতে লাগিল, শেষে নিজে বাহির হইয়া তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। কোন এক হনুমান

দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান সে দলপতি হইয়া অন্যান্য হনুমানের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে।

অসভ্য অবস্থায় মানবের জীবন যাত্রার প্রণালী অনেকটা বানরের অনুরূপ ছিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বনে বাস করিত এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকিত। তাহারা ফল, মূল, গাছের কচি পাতা, পক্ষীর ডিম, মধু ইত্যাদি খাইয়া এক বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বপেক্ষা বলবান ও বুদ্ধিমান সেই দলপতি হইত এবং দলের অন্যান্য সকলে তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। তাহাদের পা ছোট ও হাত লম্বা ছিল এবং পা অপেক্ষা হাতের বল বেশী ছিল। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিত। বৃক্ষের শাখা হইতে প্রস্তুত লাঠি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড তাহারা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। আহার সংগ্রহের চেষ্টা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তদনুযায়ী ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়াছিল। তখন তাহারা তীরধনুক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অসভ্য অবস্থায় মানব অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন ছিল। চুরি, নরহত্যা, শত্রুবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ, বলাৎকার, লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্য সকল তাহারা বাহাদুরী মনে করিত। তাহারা ভূতকে অত্যন্ত ভয় করিত এবং ঝড়, বৃষ্টি বজ্রাঘাত প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার সকলকে ভূতের কার্য্য মনে করিত।

বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীতে মানবের উৎপত্তি কাল ৫ লক্ষ বৎসর অনুমান করেন। এই ৫ লক্ষ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৪ লক্ষ বৎসর তাহাদের অসভ্য এবং বন্য অবস্থায় কাটিয়া গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল তাহা অতি সামান্য মাত্রায় ও অতি ধীরে। পরবর্ত্তী এক লক্ষ বৎসর মানব অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে

অগ্রসর হইয়াছে। শেষের ৪০০ বৎসরের মানবের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে যে জাতি বা ব্যক্তি যে পরিমাণে রক্ষণশীল তাহাদের উন্নতির মাত্রা সেই পরিমাণে বিলম্বিত হইয়াছে, এবং যাহারা পৃথিবীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুযায়ী নিজকে গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে তাহারাই টিকিয়া গিয়াছে ও উন্নতিলাভ করিয়াছে।

অসভ্য বন্য মানবের মধ্যে যেমন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের বানর-স্বভাবের অল্পবিস্তর জের আসিতে দেখা যায়, বর্ত্তমান কালের সভ্য মানবের মধ্যেও সেইরূপ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের বন্য স্বভাবের কিছু কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। চুরি, প্রতিহিংসা, মারামারি, জীবহিংসা, দলপতির অধীন থাকা, প্রচলিত প্রথার অনাবশ্যক অনুকরণ করা এই সকল মনোবৃত্তি মানবের বন্য অবস্থায় অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। মানব যতই সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে, ততই তাহার অসভ্য পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বন্যস্বভাবের নিদর্শন, যাহা এখনও তাহাতে বর্ত্তমান আছে তাহা, ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি সৎবৃত্তি সকল তাহাতে প্রকাশিত হইবে। আর্য্য ঋষিগণ এইগুলিকেই মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বা ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহম্।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

—মনুসংহিতা।

পরিশিষ্ট

১

পরমাণুর গঠন (atomic structure)

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ৯২টী প্রকার পরমাণু বা আদিভূতের (atom) কথা বলিয়াছি। ঐ পরমাণু সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক মনে করি। প্রত্যেক পরমাণুর (atom) মধ্যভাগে কতকগুলি বিদ্যুৎকণা একত্র হইয়া বর্ত্তমান থাকে। এই বিদ্যুৎকণাগুলিকে প্রোটন বা পুং জাতীয় (positive) তড়িৎ বলা হয়। আবার কতকগুলি বিদ্যুৎকণা যাহাদিগকে ইলেকট্রন বা স্ত্রীজাতীয় (negative) তড়িৎ বলা হয় তাহারা উক্ত প্রোটনগুলিকে বেষ্টন করিয়া অবিরত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এক একটী পরিমাণুতে এই উভয় জাতীয় বিদ্যুৎকণা সকল তুল্য সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় উভয়ের বিশিষ্ট ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অদৃশ্যভাবে থাকে; যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই আমরা সাধারণ পদার্থ মাত্রে দেখিতে পাই। যদি কোন পরমাণুতে (atom) প্রোটন হইতে ইলেকট্রনের সংখ্যা কম বা বেশী থাকে তাহা হইলে সেই পরমাণুর সাম্যভাব না হইয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার চঞ্চলতার প্রকাশ হয়। রেডিয়ম নামক পরমাণুতে (atom) ঐরূপ থাকায় উহা হইতে আলোকরশ্মি অনবরত নির্গত হইয়া থাকে।

একটী প্রোটন বা পুং তড়িৎকে বেষ্টন করিয়া যে সকল ইলেকট্রন বা স্ত্রী তড়িৎ পরিভ্রমণ করে তাহারা এলোমেলোভাবে বিচরণ করে এরূপ মনে করিবেন না। প্রকৃতির কার্য্যে কোথাও এলোমেলোভাব বা বিশৃঙ্খলা নাই। যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া আকাশে সূর্য্যকে

বেষ্টন করিয়া পৃথিবী, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অয়ণে এবং কালে পরিভ্রমণ করে প্রত্যেক পরমাণুতে (atom) প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া ইলেকট্রন সকল সেই প্রকার নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশ হইতে পরমাণু সকলের উৎপত্তি হইলেও এরূপ মনে করিবেন না যে কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্র জমাট বাঁধিয়া এক একটী পরমাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। একটী পরমাণুতে যে সকল প্রোটন ও ইলেকট্রন আছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আকাশ ব্যবধান থাকে। যদি একটী পরমাণুর পরিসর কলিকাতার গড়ের মাঠের সমান কল্পনা করা যায় তাহা হইলে ঐ পরমাণুস্থ ইলেকট্রনগুলির স্থিতি ঐ মাঠে ভ্রমণকারী লোকগুলির অবস্থান যেরূপ ফাঁক ফাঁক সেই মত দেখাইবে। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে উহা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। উহাকে কল্পনা সাহায্যে ধরিয়া লইতে হইবে। একটী পরমাণুর আকারের সহিত একটী ইলেকট্রনের আকারের তুলনা করিতে হইলে, একটী পরমাণুকে লাট সাহেবের বাড়ীর মত বড় মনে করিতে হইবে এবং ইলেকট্রনকে ঐ বাড়ীতে যে সকল মশা আছে তাহাদের মত বড় মনে করিতে হইবে।

এক্ষণে জানা গেল যে, এক একটী পরমাণুতে (atom) এক বা ততোধিক ইলেকট্রন মধ্যবর্ত্তী একটী বা ততোধিক পুং তড়িত বা প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া শৃঙ্খলার সহিত ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আকাশ ব্যবধান থাকে। এই মধ্যবর্ত্তী প্রোটন বা পুং তড়িতকে পরমাণুর সার বস্তু (nucleus) বলে। একটী এটমে প্রোটনকে বেষ্টন করিয়া যে ইলেকট্রনের ঝাঁক থাকে তাহা কোন আবরণীর মধ্যে থাকে কি না

এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে উত্থিত হইতে পারে। বাস্তবিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ একত্র সমাবিষ্ট ইলেকট্রন সকল পরমাণুরূপে আকাশে কোন আবরণীর মধ্যে নাই। শূন্যময় আকাশে ইলেকট্রন সকল প্রোটনরূপ একটী সার বস্তুকে (nucleus) বেষ্টন করিয়া কোন আবরণীর মধ্যে না থাকিলেও বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে না। সৌরজগতে যে কারণে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদি আকাশে পরিভ্রমণ করে শূন্যমানে ছুটিয়া যায় না সেই কারণেই পরমাণুস্থ ইলেকট্রন বা স্ত্রী তড়িত-কণা সকল প্রোটন বা পুং তড়িতকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে কদাচ বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়ে না। একজাতীয় একটী পরমাণু অন্য জাতীয় এক বা ততোধিক পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া একটি অণুর (molecule) সৃষ্টি হয়। এই অণুই আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকলের সূক্ষ্মাংশ।

২

রমণ রশ্মি (Raman rays)

আপনারা বোধ হয় অনেকেই ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সার সি, ভি, রমণ, কে, টি মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন। ইনি সূর্য্যকিরণের একটী অভিনব রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ রমণরশ্মি আখ্যা দিয়াছেন। এই রশ্মি আবিষ্কার করিয়া অধ্যাপক রমণ বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। ভারত সম্রাট এই উভয়কেই নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। এই কবিতা পুস্তক লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলন। অধ্যাপক রমণ যে বৈজ্ঞানিক তথ্য

আবিষ্কার করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাহার প্রকৃত পরিচয় বোধহয় অনেকেই জানেন না। ইহা দুরূহ ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয় হইলেও আমি ইহাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল করিয়া নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ C. V. Raman একটী সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত আপন বিজ্ঞানাগারে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যটীর বিষয় এতাবৎকাল কেহই বিশেষ যত্নের সহিত চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। বহু পূর্ব্বে Lord Raylaigh এবিষয় কিয়ৎ পরিমাণে গবেষণা করিয়াছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন যে আকাশের বর্ণ নীল, কিন্তু কি কারণে ইহার এরূপ বর্ণ দৃষ্ট হয় সে বিষয় Lord Raylaigh একটা মোটামুটী সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু অধ্যাপক রমণ তাহার সেই মোটামুটী ধারণায় সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি আরও ইহা বিষদ্‌ভাবে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন, এবং অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত ১১ বৎসরকালব্যাপী এসম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি আকাশের নীলবর্ণ, সমুদ্রের জলের নীলাভা, হিমাদ্রি শিখরের তুষাররাজীর বিভিন্ন প্রকার রংএর খেলা, তাঁহার গবেষণাগারে একটী সামান্য বোতলের ভিতর দেখা যাইতে পারে কিনা তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল স্বাভাবিক দৃশ্যাদি ভাবপ্রবণ কবিদের অতি মনোরম, তাঁহারা এই নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া যান, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভিতর দিয়া ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ ও সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমাকীর্ত্তন করিতে থাকেন।

কিন্তু অধ্যাপক রমণের প্রাণে এরূপ উচ্ছ্বাস এতই গভীর হইয়া-

ছিল যে তিনি এই রহস্যের সমূহ আলোচনার নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অধ্যাপক তখন আপন বিজ্ঞানাগারে নিজ ছাত্রদের সাহায্যে একটী সূর্য্য আলোকের প্রতিরূপ প্রস্তুত করিলেন এবং বোতলের ভিতর নানারূপ রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রণ করিয়া এই আলোকের প্রয়োগ দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে এই সকল বর্ণের উদ্ভব যে কেবল রংএর খেলা তাহা নহে, ইহার ভিতর নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। এই বর্ণরশ্মি সকলের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি জানিলেন যে ঐ পদার্থের অণু সকলের মধ্যে এরূপ একটী বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল যাহা হইতে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিবিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

কোনও বোতলে তিনি কেবলমাত্র পরিস্রুত জল রাখিয়া তাহার ভিতর উক্ত আলোকের একটীমাত্র রশ্মি প্রবেশ করাইয়া লক্ষ্য করিলেন যে উহা বোতলের ভিতর হইতে বাহির হইবার কালীন অপর একটী বিভিন্ন রশ্মি উহার সহিত বাহির হইতেছে। এইরূপে তিনি বিভিন্ন-প্রকার তরল পদার্থের ভিতর দিয়া পূর্ব্বোক্ত আলোকরশ্মি প্রবেশ করাইয়া প্রত্যেক বারেই এক একটী বিশিষ্ট রশ্মি উক্ত তরল পদার্থের রাসায়নিক গঠন (Composition) অনুসারে বাহির হইতে দেখিয়াছিলেন ও তাহাদের আলোক চিত্র (Photograph) লইয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত রশ্মি এত ক্ষীণ যে পূর্ব্বে অন্য কোনও গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক ইহার আলোকচিত্র লইতে সমর্থ হন নাই, এবং এই জন্যই এরূপ কোন রশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই, যদিও অধ্যাপক Compton রঞ্জনরশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে এই প্রকার কোন একটী বিশিষ্ট রশ্মির আভাস পাইয়া ছিলেন। অধ্যাপক রমণ এত সহজে সাধারণ আলোকের সাহায্যে যে একটী নূতন

রশ্মি আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে প্রথমে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমেরিকার প্রফেসার Wood বাস্তবিকই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এত সূক্ষ্ম রশ্মির আলোক-চিত্র লওয়া অত্যন্ত কঠিন এ কারণ অধ্যাপক রমণের আবিষ্কৃত আলোক চিত্রের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পরে তিনি স্বহস্তে ঐ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অগাধ ধনভাণ্ডার তাঁহার আয়ত্তাধীন থাকায় তিনি এক বিরাট কৃত্রিম সূর্য্য প্রস্তুত করিলেন, এবং ৫ ফুট লম্বা একটী বোতলের ভিতর তরলপদার্থ পুরিয়া ঐ আলোক-চিত্র লইতে আরম্ভ করেন। আলোক-চিত্র যখন প্রস্তুত হইল তখন তাহাতে দেখা গেল যে অধ্যাপক রমণের আবিষ্কৃত রশ্মি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক Woodএর পরীক্ষার ফলে এই আবিষ্কারের অকাট্য সত্য প্রমাণ হইয়া গেল। এরূপ পরীক্ষা পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতে পারে না, এ কেবল প্রচুর অর্থশালী আমেরিকাতেই সম্ভব।

এই আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের একটী নূতন পন্থা বাহির হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী গবেষণাকারিগণ এই উপায়ে প্রতিদিন বিভিন্ন পদার্থের নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার ও আণবিক গঠনের (atomic structue) প্রকৃত সত্য সকল নির্ণয় করিতেছেন। এই রশ্মির প্রভাব যেরূপ গবেষণাকারিগণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পদার্থ বিশ্লেষণে অনেক সুবিধা হইবে ও শিল্প ও ব্যবহার্য্য বস্তু নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইবে।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্য পুস্তক

ভট্টাচার্য্য পরিবার

সচিত্র উপন্যাস

Approved by the Government of Bengal

as Prise and Library-book.

মূল্য—১।০

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও বিদ্বানমণ্ডলীর অভিমত

মাননীয় জষ্টিস্ সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডি, এল্ মহাশয় "ভট্টাচার্য্য পরিবার" পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন :—

আপনার প্রদত্ত "ভট্টাচার্য্য পরিবার" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

পুস্তকখানি যদিও গোল্ডস্মিথের Vicar of Wakefield নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, অনুবাদ বা অনুকরণে যে সকল দোষ প্রায়ই থাকে, তাহার কিছুই ইহাতে দেখা যায় না। বিদেশীয় উপন্যাস ও তাহার ঘটনাসমূহ এবং বিজাতীয় চরিত্র ও ভাবগুলি এমন সুন্দররূপে বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে যে, তৎসমুদয় যে আমাদের স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বিষয় নহে, এ কথা কেহ সহসা বলিতে পারেন না। সত্য বটে, আপনার পুস্তকের এই গুলি মূল গ্রন্থের চরিত্র ও ভাবগুলির সার্ব্বভৌমিকতার উপর কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করিতেছে; কিন্তু মূলের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে বাদ দিলেও আপনার অনুবাদের প্রাপ্যাংশ কোন ক্রমেই কম হইবে না। এই পুস্তক প্রণয়নে আপনি যথেষ্ট রচনাকৌশল দেখাইয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে ইহা একটি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর মহাশয় উক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন :—

সুলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই 'ভট্টাচার্য্য পরিবার' উপন্যাসখানি পড়িয়াছিলাম অনেকদিন পূর্ব্বে—১৯০৩ অব্দে। এখনও কিন্তু বইখানির কথা মনে আছে। প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফুরাইয়া গিয়াছিল, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। এতদিন পরে গ্রন্থকার মহাশয় উপন্যাসখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতেছেন শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। সেই আনন্দ প্রকাশের জন্যই বহুপূর্ব্বে অধীত বইখানি শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর অনুগ্রহে আর একবার এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলাম। আমার ত মনে হয়, অক্ষয় বাবু যদি ভূমিকায় না বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেক ইংরেজীনবীশও ধরিতে পারিতেন না যে, এখানি Vicar of Wakefieldর ছায়া লইয়া লিখিত। ইহা উক্ত পুস্তকের অনুবাদ যে নহে, তাহা পুস্তকখানির দশ লাইন পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়—ভাষা এমন সুন্দর, এমন সরল ; বর্ণনা এমন মনোরম ; আর ঘটনা-সংস্থানেও গ্রন্থকারের কৃতিত্ব আছে, যদিও তিনি Vicar of Wakefield হইতে অনুপ্রাণনা পাইয়াছেন। প্রবীণ লেখক মহাশয় 'ভট্টাচার্য্য-পরিবারে'র দ্বিতীয় সংস্করণ এতকাল পরে ছাপাইয়াই সাহিত্যের দরবার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন, এ কথা যেন না ভাবেন ; তাঁহার ন্যায় কৃতী লেখকের নিকট বাঙ্গালী পাঠক অনেক আশা করেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী,
১৯২৫

শ্রীজলধর সেন